জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে

দ্বারকানাথ ঠাকুর

ঐতিহাসিক সমীক্ষা

রঞ্জিত চক্রবর্তী

গ্রন্থবিতান
৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা—৭০০ ০২৬

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক : ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী
গ্রন্থবিতান
৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা—৭০০ ০২৬

মুদ্রক : শ্রীশান্তিময় বানার্জী
প্রিণ্টার্স কনার প্রাইভেট লিমিটেড
১, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলকাতা—৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মুদ্রাঙ্কণ
৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০১২

যাঁদের দৃষ্টান্ত ও সান্নিধ্য
আমার চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছে
তাঁদের সকলের উদ্দেশে

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্তরকালের মানুষদের নিকট এক বিস্ময়, একটি শাণিত জিজ্ঞাসা। তা শুধু কবির পিতামহ রূপে নয়, বা ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্যের স্মারক রূপেও নয়, অথবা রবীন্দ্রনাথের বিপুল অবদানের সঙ্গে বিজড়িত স্মৃতি রূপেও নয়, জমিদার ধনবাদী ব্যবসায়ের সংগঠক, শিল্পোদ্যমে অগ্রণী, পাশ্চাত্য জীবনদর্শনে দীক্ষিত এবং রামমোহন রায়ের সহযোগী রূপে তিনি বাংলার রেনেসাঁসের প্রাথমিক স্ফুরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সুতরাং তাঁর কর্ম এবং নানাবিধ বৈষয়িক প্রয়াসের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। জাতীয় বিবর্তনের প্রেক্ষিতে এর মূল্যায়ন অপরিহার্য।

সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে উল্লেখনীয় গ্রন্থাদি প্রকাশিতও হয়েছে। একজন বিদেশী গবেষকের দৃষ্টিতে দ্বারকানাথ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা-স্থপতিদের অন্যতম অংশীদার, আর, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ স্বদেশী গ্রন্থকারের নিকট তিনি ছিলেন একজন অগ্রচারী পথিক, যদিচ ইদানীং বিস্মৃত। অতীতের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা যে প্রেক্ষিতই গ্রহণ করি না কেন, এবং সে প্রেক্ষিত অনুসরণ করে যে সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই না কেন, আসল সমস্যা হলো সেই ব্যক্তিত্বের সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করা, তার বিচরণ ভূমির সীমা নির্দিষ্ট করা, এবং তা থেকে উদ্‌ভূত সামাজিক-আর্থনীতিক-রাষ্ট্রিক সম্পর্কগুলোর পরিচয় গ্রহণ করা। অন্য কথায়, তাঁর কর্ম, জীবন ও চিন্তার পটভূমিকে জীবন্ত করে তোলা, একমাত্র সে পদ্ধতিতেই তাঁর ভূমিকাকে বাস্তব সত্যের যথাযথতায় এবং সমগ্রতায় উপলব্ধি করা সম্ভব। আর, সে পথেই ঐ ভূমিকার ঐতিহাসিক তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়।

সেই পটভূমি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও কয়েকটি বিষয় সর্বদাই স্মরণে রাখা প্রয়োজন। সেগুলো হলো, আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ভারতবর্ষের সম্পদ লুণ্ঠন, আর্থনীতিক উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতারণা এবং বিপুল জনসমষ্টির শোষণ; লুণ্ঠন-প্রতারণার অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে দেশীয় সহায়ক ও অংশীদারদের আবির্ভাব; বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে নতুন ভূস্বামী অর্থাৎ জমিদার সৃষ্টি; ভারতবর্ষের শোষণের দাবিতে বৃটিশ একচেটিয়া ও অবাধ বাণিজ্যবাদীদের অন্তর্বিরোধ এবং কলকাতায় অবাধ বাণিজ্যবাদীদের অনুকূলে রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক বিরোধ ও অবশ্যম্ভাবী সামাজিক আলোড়ন; ইত্যাদি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপনায় লুণ্ঠন-প্রতারণা-শোষণ যে মুখ্য কথা, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না; এর ভয়াবহ চিত্র উন্মোচন করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থে।

দ্বারকানাথ এই সামাজিক আবর্তের সন্তান, এবং ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে নানাবিধ কর্মোদ্যোগের সম্পর্কে সম্পর্কিত থেকে তিনি ঐ পটভূমিকে বিচিত্রতর, জটিলতর করেছিলেন। তিনি বেনিয়ানগিরি করেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরি করেছেন, বিপুল ভূসম্পত্তি ক্রয় করে ও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে জমিদারে রূপান্তরিত হয়েছেন, ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পোদ্যোগ ও যৌথ কারবার সংগঠন করেছেন, রপ্তানী বাণিজ্য ও নীল কুঠী পরিচালনা করেছেন, ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যবাদীদের রাজনৈতিক সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সর্বোপরি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতি একান্ত অনুগত। সুতরাং, এই বিচিত্র মানুষটির ভূমিকার মূল্যায়ন পটভূমির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত।

শ্রীরঞ্জিত চক্রবর্তী প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামগ্রিক পটভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত সূত্রাদি পুনরায় পরীক্ষা করেছেন, তথ্যাদি যাচাই করতে গিয়ে সন-তারিখ সংক্রান্ত ও অন্যান্য কিছু কিছু গরমিল তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। গ্রন্থের যথাস্থানে সেগুলো আলোচিত হয়েছে, এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যথার্থ যুক্তি ও তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। কর্মধারা অনুসারে তিনি দ্বারকানাথের জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তাঁর

ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত করেছেন, এবং কবির পিতামহকে নতুনভাবে আমরা আবিষ্কার করেছি।

সেই অরাজক লুণ্ঠনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে বেনিয়ানরা সাহেব বণিকের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য টাকার 'ডাক'-এ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। কোন একজন যদি ডাকে দু হাজার, তার পরের জন পাঁচ হাজার, তার পরের জন দশ হাজার, তার পরের জন সম্ভবত আরও বেশি। এই যে বেনিয়ান রূপে গৃহীত হওয়ার জন্য টাকার ছড়াছড়ি ও বেপরোয়া মনোভঙ্গি, তার পশ্চাতে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস তাদের ছিল যে বাণিজ্যিক প্রতারণার মাধ্যমে ঐ টাকা– একে ঘুষই বলি বা নজরানাই বলি—উঠে আসবেই।

দ্বারকানাথ ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, মদ-আফিম ইত্যাদি আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ রঞ্জিতবাবু দিয়েছেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ থেকে দেখা যায়, জাঁদরেল সায়েব কোম্পানীগুলোকে যদৃচ্ছভাবে, ব্যবসায়িক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে, ঋণ দান করা হয়েছে; এমন কি, কোন এক কোম্পানীর পতন প্রত্যাসন্ন জেনেও সেই কোম্পানীকে মূলধনের প্রায় অর্ধেক টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, অথচ ঐসব ঋণ পরিশোধের কোনই নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তী হিসাবে দেখা গেছে, মাত্র ছ'টি বাণিজ্য কুঠী সর্বসাকুল্যে তিয়াত্তর লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিল। এই ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র সম্পর্কে অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মন্তব্য করেছিলেন, প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়েই হিসাবে কারচুপি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, একটি-দুটি ঘটনা আমাদের বিস্ময়ের সঞ্চার করে। গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায়, হঠকারিতার জন্য ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক সিম্ সায়েবকে ১৮৩৮ সনে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু, দ্বারকানাথ তাকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করেন। এর পরের বছরই ঐ হিসাবরক্ষক প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা তছরুপ করার অভিযোগে পুনরায় অভিযুক্ত হয়। ঘটনাটি দ্বারকানাথের গোচরে আনা হলে তিনি ব্যাঙ্কের পরিচালকদের নিকট প্রস্তাব দেন যে, তছরুপের ব্যাপারটি গোপন রাখা হলে তিনি স্বয়ং ঐ টাকা পরিশোধ করবেন। তিনি টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন, ঘটনাটি কিন্তু গোপন ছিল না। কোন্ উদ্দেশ্যে বা স্বার্থে দ্বারকানাথ এমন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তা অজ্ঞাত। এটা সুবিদিত যে, প্রবাসে মৃত্যুর পূর্বে রামমোহন রায় নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন

যাপন করছিলেন ; যে এজেন্সি হাউসের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সেই ম্যাকিনটশ কোম্পানী ঐ সময়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। এ দিকে, কলকাতার সংবাদে দেখা যাচ্ছে, দ্বারকানাথ ম্যাকিনটশ কোম্পানীর বিষয়সম্পদ কিনে নিচ্ছেন, কিন্তু বিদেশে বিপদ্গ্রস্ত বন্ধু রামমোহনের সহায়তায় এগিয়ে যান নি। এসব ঘটনা থেকে লুঠেরা বণিকদের নীতিবোধ ও মূল্যবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা কোনরূপ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না।

নতুন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাবের যে নেপথ্য ইতিহাস, তা নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। রঞ্জিতবাবু এ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দান করেছেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনার পক্ষে এটুকু স্মরণে রাখাই যথেষ্ট যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া এবং প্রজাদের কাছ থেকে যদৃচ্ছ খাজনা আদায়ের অধিকার অক্ষুন্ন থাকার ফলে জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁদের আনুগত্যও হয় নিঃসর্ত। একথা সুবিদিত যে, দ্বারকানাথ ভারতবর্ষে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য ও বসবাস করার অর্থাৎ কলোনাইজেশনের পক্ষপাতী ছিলেন। একথাও তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মত মানুষদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য তাঁরা ইংরেজ শাসনের নিকটই ঋণী। ফলে, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগতভাবে ইংরেজ সাযুজ্যে স্থিত থাকা তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্তোর প্রেয়োবাদী জীবনদর্শন, ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা তার সত্তাকে গ্রাস করে। কলকাতার সায়েবসুবাদের আমোদপ্রমোদের নিয়মিত অনুষ্ঠান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এরই প্রগল্ভ অভিব্যক্তি দেখা যায় বিলাত-প্রবাসের দিনগুলোতে। ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া এবং অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ মহিলার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি বিপুল অর্থব্যয় করেছেন ; থাকতেনও রাজকীয় বিলাস-বাহুল্যের পরিবেশে। এটা অনুমান করা সম্ভবত অসঙ্গত নয় যে, ঐ ব্যয়বাহুল্যের দরুণই তিনি পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে আড়াই লক্ষ টাকায় তাঁর একটি জমিদারি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত, আলোচ্য খাতে দ্বারকানাথের যে পরিমিতিহীন ব্যয়, তার তুলনায় স্বদেশে জনহিতকর কাজে তাঁর বদান্যতা যেন ম্লান। প্রত্যাশা অবশ্যই কিছু ছিল, উচ্চ রাজ-সম্মানলাভের প্রত্যাশা। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তা চরিতার্থ হয় নি। বরং, বিলাত প্রবাস কালেই তাঁকে রহস্যজনক মৃত্যুবরণ করতে হয়।

অথচ, এই মানুষটিই তাঁর অবস্থানের বাধ্যবাধকতায় কলকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। রামমোহনের তিনি ছিলেন সহকর্মী; রামমোহনের ভাবাদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু প্রভেদ একটা থেকেই গেছে। বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তায় রামমোহন ছিলেন অনন্য, অগ্রচারী; তাঁর মননের জগৎ ছিল বিশ্বময় ব্যাপ্ত। এ বিষয়ে দ্বারকানাথের অনুরাগ ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া, দেশের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামো, বিধিব্যবস্থা, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি সম্পর্কে রামমোহন ছিলেন ভাবিত, এ বিষয়ে নানাবিধ সুপারিশ সহ তথ্যপূর্ণ স্মারকলিপিও তিনি ভারত-বিধায়কদের নিকট পেশও করেছিলেন। এবংবিধ ভাবনায় দ্বারকানাথ কখনও উদ্বিগ্ন হন নি। একই পরিবেশ থেকে উদ্ভিন্ন সমগোত্রীয় দুজন মানুষের মানসজীবনের স্বতন্ত্র বিবর্তন ও গুণগত পার্থক্য সেজন্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্ভবত লুঠেরা বাণিজ্য-সম্পর্কের সম্মোহ তাঁর চৈতন্যকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

শিল্পোদ্যোগে দ্বারকানাথের যে অপরিসীম উৎসাহ ও তথাকথিত অগ্রচারিতা তা ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার, শিল্পবিকাশের পক্ষে কতখানি সহায়ক হয়েছিল, অথবা আদৌ সহায়ক হয়েছিল কিনা, সে প্রশ্নটিও বিবেচ্য। শতাব্দীর শেষার্ধে, সত্তরের দশকে, ভোলানাথ চন্দ্র স্বদেশী ব্যাঙ্ক, স্বদেশী বাণিজ্যিক কর্পোরেশন, স্বদেশী চেম্বার অব কমার্স, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিলেন, বলেছিলেন বিদেশী মূলধনের বদলে স্বদেশী মূলধন সৃষ্টির কথা। তাঁর উচ্ছ্বাসের পশ্চাতে অবশ্যই ছিল জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা। তাঁর কালের সঙ্গে দ্বারকানাথের কালের গুণগত প্রভেদ, জাতীয় মনোভঙ্গি তখন উন্মেষিত হয় নি, হওয়ার কথাও নয়। সুতরাং, তাঁর শিল্পোদ্যম জাতীয় শিল্প-উন্নয়নের ভাবনার ফসল নয়। তিনি যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অথবা স্বকীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। হতে পারতও না; কারণ নৈতিক মূল্যমান ও প্রাথমিক সততা দ্বারা পরিচালিত নয়, এমন সব ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কিছুকাল তাদের যদৃচ্ছ লুণ্ঠন-প্রতারণা চালিয়ে যেতে পারে, দীর্ঘকাল পারে না। আপন অসততার ভারে তা একসময় ভেঙ্গে পড়ে। কার্যত হয়েছিলও তাই। তাঁর পৌত্র—রবীন্দ্রনাথ—যে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

যাই হোক, এই বিচিত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি শ্রীরঞ্জিত চক্রবর্তীর গ্রন্থের বিষয়বস্তু। কোনপ্রকার আবেগ অথবা ব্যক্তিগত সংস্কার দ্বারা তিনি পরিচালিত হন নি। সত্যনিষ্ঠা ও বিষয়গত নির্লিপ্ততার সহায়তায় তিনি দ্বারকানাথের বিচরণভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছেন; সেই পটভূমিই আপনাকে এবং দ্বারকানাথকে সৃষ্টি করেছে। পুনরায় বলি, এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল পাঠকদের নিকট এই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

অরবিন্দ পোদ্দার-

গ্রন্থকারের নিবেদন

সমকালীন ইতিহাসের পটভূমিকায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন পর্যালোচনার পরামর্শ লাভ করেছিলাম শ্রদ্ধেয় ড. অরবিন্দ পোদ্দারের কাছ থেকে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের সে-ইচ্ছা অপূর্ণ থাকায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে আক্ষেপ করেছেন। বিদ্যাসাগরের কলমে দ্বারকানাথ কীভাবে চিত্রিত হতেন তা অজ্ঞাত। তবে এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের একটি উক্তি স্মরণীয়—"আমি আগে ছিলাম মতিলাল শীল, এখন হইয়াছি দ্বারকানাথ ঠাকুর।" এই উক্তির ব্যাখ্যায় চণ্ডীচরণ বলেছেন: "মতিলাল শীল অপরিচিত স্থলে লোককে ভাল বলিয়াই স্থির করিতেন, আর দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিচিত স্থলে ঠিক তাহার বিপরীত ধরিয়া রাখিতেন।" ('বিদ্যাসাগর', সপ্তম সংস্করণ, পৃ ৩৭৪)। সুতরাং কৃতঘ্নদের দ্বারা উৎপীড়িত পরোপকারী বিদ্যাসাগরের উক্তি থেকে হিসেবী বিচক্ষণ দ্বারকানাথের একটি চিত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই চিত্র পূর্ণ চিত্র নয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। তদুপরি একথাও সংবিদিত যে, আধুনিক বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পুষ্পিত উদ্যানের অনেকখানি স্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত। তবু, দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বয়ং যে উনিশ শতকের 'একজন কীর্তিমান পুরুষ' ছিলেন সেকথা অস্বীকার করা যায় না বলেই ইতিহাসে দ্বারকানাথের অবস্থান পর্যালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের আঙ্গিনা পেরিয়ে ইতিহাসের যে-প্রাঙ্গণে দ্বারকানাথ সচল সজীব একদিকে তা যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের অনিষ্ট দ্বারা লাঞ্ছিত, অন্যদিকে তেমনি তা আবার নবযুগের সূতিকাগার বলে চিহ্নিত। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠভাবে দ্বারকানাথের জীবন ও কালের পর্যালোচনা যে কিছুটা জটিল আশা করি সহৃদয় পাঠক তা অনুধাবন করবেন। তবে আশার কথা, এই গ্রন্থ রচনার কাজ যখন চলছে তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে রচিত দু'টি ইংরেজী গ্রন্থের আলোচনায় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছিলেন: "দুঃখিত এই ভেবে যে কোনো বাঙালী গবেষকের দৃষ্টি এদিকে

এখনও পড়েনি।"* গবেষকের দৃষ্টিপাতের প্রশ্নে বর্তমান গ্রন্থটি কতখানি সফল তা সুধী পাঠকবৃন্দের বিচার্য। তবে লেখক হিসেবে আমার প্রয়াস ছিল বস্তুনিষ্ঠায় আশ্রিত থেকে তথ্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট কালের পটভূমিকায় দ্বারকানাথের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করা। এই প্রয়াস সহানুভূতিশীল পাঠকের নিকট প্রতিভাত হলে শ্রম সার্থক মনে করব।

ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতাংশের লেখককৃত বঙ্গানুবাদ ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'Memoir of Dwarkanath Tagore'-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ (কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত) থেকে বাংলা উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের 'প্রসঙ্গকথা' অংশটি মূল্যবান সংযোজন বলে মনে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে অনেক শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি, তন্মধ্যে সুহৃদ্‌বর্গের অন্যতম শ্রীপ্রদীপ রায়, শ্রীতরুণ মিত্র ও ড সুকুমার ভট্টাচার্য নানাভাবে যে সহায়তা করেছেন সেজন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকটও— গ্রন্থাগারস্থিত দ্বারকানাথের মর্মর মূর্তির আলোকচিত্র গ্রহণের ও গ্রন্থে ব্যবহারের অনুমতি দানের জন্য। এবং উক্ত মর্মর মূর্তির আলোকচিত্র সাগ্রহে তুলে দেওয়ার জন্য প্রীতিভাজন শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। সতীর্থ-বন্ধু শ্রীরণেশ ভট্টাচার্য 'নির্দেশিকা' প্রণয়নের কাজে যে সাহায্য করেছেন সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থ প্রসঙ্গে শ্রীমতী রমা চক্রবর্তীর উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা উল্লেখনীয় হলেও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধন্যবাদ প্রদানের উর্ধ্বে। একান্ত সুহৃদ্‌ শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্তী গ্রন্থ প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে আন্তরিকভাবে ঋণাবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে, সবিনয় উল্লেখ করতে হয় যে, বাংলার 'রেনেসাঁস'-এর গবেষণা-খ্যাত শ্রদ্ধেয় ড. পোদ্দার শুধু গ্রন্থের ভূমিকাই লিখে দেন নি, আগাগোড়া জ্যেষ্ঠের অকৃপণ সহায়তা দান করেছেন, সেজন্য তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও তাঁর কাছে নিজেকে অঋণী ভাবতে পারছি না।

রঞ্জিত চক্রবর্তী

সূচিপত্র

১

দেওয়ানি ও জমিদারি

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৯৪ খ্রী.) তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থার সূচনাকাল। এই সূচনাপর্বেরই এক অধ্যায়ে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদৃচ্ছ করনীতি অনুসরণ করে কোম্পানি সরকারের রাজস্ববৃদ্ধির অভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছিলেন। জবরদস্তি কর নির্ধারণ করা ছাড়াও হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল—ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক বা চিরাগত ভোগ-দখল ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া।[১] আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হেস্টিংস-প্রশাসন এত অত্যাচারী* ছিল যে বকেয়া কর আদায়ের জন্য জমির রায়ত-মালিককে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তো বটেই, এমন কি পুত্রকন্যা ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদেরও বিক্রি করতে বাধ্য করা হতো।[২] এরূপ প্রজা-নিপীড়নের হাতিয়ার ছিল একদিকে হেস্টিংস-প্রশাসন ও অন্যদিকে অনুসৃত স্বৈরাচারী পত্তনি-প্রথা। হেস্টিংসের আমলে নীলামের ডাকে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীকে জমি বিলি করার ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক সময় আবার কোন নিয়মনীতি অনুসরণ না করেই বেনিয়ান বা অনুগতদের আঞ্চলিকভাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হতো।[৩] তৎকালে নীলামে জমি ক্রয় করে অথবা কোম্পানি সরকারের মোসাহেবি করে পারিতোষিক হিসেবে জমিজমা লাভ করে একদল

* টীকা 'ক' দ্রষ্টব্য।

নতুন ভূস্বামীর উদ্ভব ঘটে।* লক্ষণীয়, ইংরেজ আমলেই প্রথম জমিজমার ক্ষেত্রে নগদ অর্থের প্রভাবজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং বেনিয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা সরকারী আনুকূল্যে ও অর্থের সামর্থ্যে জমির মালিক হতে শুরু করে। সুতরাং প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দেশজ সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও নীতিবোধ সক্রিয় ছিল সেই ধারাবাহিক সামাজিক রীতিনীতি থেকে মুক্ত, অর্থকৌলিন্য-জাত এই নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর ভবিষ্যৎ দৃঢ়তা লাভ করে কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, কোম্পানি আমলে সৃষ্ট এই জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল ইংরেজ শাসননির্ভর ও সিদ্ধির চাবিকাঠি ছিল বিদেশী সরকারের তাঁবেদারি। 'এই নবীন ভূস্বামী শ্রেণীকে অভিজাত সামন্ত শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া কঠিন'[৪] বলে প্রতিভাত হলেও পরাধীন ভাবতে এই নতুন জমিদার শ্রেণীই ধনে-মানে-গরিমায় মর্যাদার আসন অধিকার করে বসেছিল। কীভাবে তা সম্ভবপর হয়েছিল, বর্তমান প্রসঙ্গ বহির্ভূত সে এক ভিন্ন ইতিহাস।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ইংরেজ আমলে সৃষ্ট এক জমিদার পরিবারেরই উত্তরপুরুষ। কলকাতার এই ঠাকুর পরিবারের অতীত যশোহর জেলায়।** জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা

* "কলিকাতাস্থ দেব-পরিবার, ঘোষাল পরিবার, রায়-পরিবার, সিংহ-পরিবার, ঠাকুর-পরিবার সমুদয়ই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ আমলের সৃষ্টি। ইহারা প্রায় প্রত্যেকটিই নানাভাবে ইংরেজদের সহায়তা করিয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে নবলব্ধ অর্থের দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করতঃ জমিদার আখ্যা লাভ করে।" (যোগেশচন্দ্র বাগল : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃ ১)। "কাশিমবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন সাধারণ সিল্ক ব্যবসায়ী ; ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট হইতে তিনি ভূসম্পত্তি লাভ করেন ; শোভাবাজার স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ওয়ারেন হেস্টিংসের মুন্সী ছিলেন।" (অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম মানস, ১৯৬৬, পৃ ১৯)।

** বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত) ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়-এ 'পিরালী সমাজের ইতিহাস'

দ্বারকানাথের পিতামহ নীলমণি ঠাকুরের তিন পুত্র—রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। রামলোচন ঠাকুর নিঃসন্তান অবস্থায় মধ্যম ভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় পুত্র শিশু দ্বারকানাথকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। রামলোচনের অবস্থা অন্য ভাইদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ছিল এবং তিনি যে বিলাসপ্রিয় ছিলেন তাও জানা যায়।[৫] ১৮০৭ সালে রামলোচনের মৃত্যু হলে তের বছরের নাবালক দ্বারকানাথের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাতা অলকাসুন্দরী (রামলোচনের স্ত্রী) এবং ভ্রাতা রাধানাথ (রামমণিব জ্যেষ্ঠ পুত্র)। ১৮১২ সালে সাবালক দ্বারকানাথ জমিদারির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন এবং ইতোমধ্যে দিগম্বরী দেবীর সঙ্গে দ্বারকানাথের বিবাহ সংঘটিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দ্বারকানাথের জমিদারি তেমন বিস্তৃত না হলেও খুব ছোটও ছিল না।[৬] রামলোচনের উইলে* কলকাতার সম্পত্তি ছাড়া পরগনা বিরাহিমপুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু কটকের সম্পত্তির উল্লেখ নেই। পরবর্তী কালে দ্বারকানাথের সম্পত্তির মধ্যে কটক সম্পত্তির (পাণ্ডুয়া ও বালিয়া মহাল) যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা দ্বাবকানাথের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার সময়সূত্র নিয়ে মতভেদ রয়েছে।[৭]

দ্বাবকানাথ বাল্যে তৎকালের সম্ভাব্য শিক্ষালাভ করলেও পরিণত জীবনে যে স্তরে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন তার পক্ষে সে-শিক্ষা যথেষ্ট ছিল না। সেজন্য প্রশংসনীয় উদ্যমশীলতা দ্বারা তিনি শিক্ষার অপূর্ণতা দূর করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি উত্তমরূপে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা ছাড়া, ফার্সী ও আরবী ভাষায়ও দক্ষতা

বর্ণিত হয়েছে এবং এই অধ্যায়েই ঠাকুর পরিবারের বৃত্তান্ত উল্লেখিত হয়েছে। এই গ্রন্থের 'বক্তব্য' অংশে নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন যে, "১৬১ হইতে ৩৬০ পৃষ্ঠা মুস্তফী মহাশয়ের রচনা"—১৬১ পৃষ্ঠা থেকেই ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ, সুতরাং 'পিরালী-সমাজের ইতিহাস' ব্যোমকেশ মুস্তফী রচনা করেছেন।

*রামলোচনের উইল—টীকা 'খ' দ্রষ্টব্য।

অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জমিদারি কাজে আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক মনে করে তৎকালের বিখ্যাত এটর্নী কাটলার ফার্গুসনের কাছে আইনের পাঠ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন—"বাস্তবিক দু' জন লোক তাঁর প্রথম জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন: তাঁর মননশক্তি উদ্বোধনে সহায়তা করেছিলেন রামমোহন এবং আইনবিষয়ক চিন্তাকে জাগ্রত করেছিলেন মিঃ কাটলার ফার্গুসন।...রেগুলেশন আইন সম্বন্ধে তিনি যে শুধু প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা নয়, সে-যুগের সুপ্রীম কোর্ট, সদর ও জেলা আদালতের আইন-প্রয়োগরীতি সম্পর্কেও তিনি বহু বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।"[৮] আইন বিষয়ে পারদর্শী দ্বারকানাথ শুধু নিজের জমিদারি কাজেই ব্যস্ত থাকেন নি, অনেক রাজা-জমিদারের ল-এজেন্ট রূপেও কাজ করতেন। তাঁর মক্কেলদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, যশোহরের রাজা বরদাকণ্ঠ রায়, কাশিমবাজারের হরিনাথ রায়, পাইকপাড়া রাজপরিবারের রাণী কাত্যায়নী, বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সফল মামলা পরিচালনার জন্য খ্যাতির ফলে দ্বারকানাথ অন্যান্য প্রদেশের জমিদারদেরও আইন উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮২০-২১ সালের মধ্যেই দ্বারকানাথ তেজারতি কারবার, বেনিয়ানবৃত্তি ও রপ্তানী বাণিজ্যে নিজের কর্মজগৎ বিস্তৃত করেছিলেন। এই সময়সীমার মধ্যে দ্বারকানাথ শুধু ঐতিহাসিক পুরুষ রামমোহন রায়ের সঙ্গেই যে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তা নয়, কলকাতার গণ্যমান্য সামাজিক পরিবেশেও তিনি তখন একজন পরিচিত ব্যক্তি।

॥ কোম্পানির দেওয়ানি ॥

এই পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে আটাশ বছর বয়সে (১৮২২ খ্রী.) দ্বারকানাথ চাব্বিশ-পরগনার কালেক্টরের অধীন সেরেস্তাদারের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের এই চাকরি গ্রহণ শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, প্রশ্নও জাগায় যে, স্বাধীন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি

যখন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জনে সক্ষম তখন বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করার স্পৃহা তাঁর মনে স্থান পেল কেন? দ্বারকানাথের পূর্বে উল্লিখিত সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন রামমোহন রায়ের সম্পর্কিত ভাই রামতনু রায়। এই পদের মাসিক বেতন ছিল ১৫০ টাকা এবং বাৎসরিক কমিশন ছিল গড়পরতা ৩২০ টাকা।[৯] সুতরাং অর্থের প্রশ্নটি এই পদ গ্রহণে দ্বারকানাথকে আকৃষ্ট করে নি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমান, রামমোহনের দৃষ্টান্তে ও তাঁর পরামর্শে দ্বারকানাথ এই চাকরি নেন।[১০] এই অনুমান অবাস্তব না হলেও, বোধ হয়, প্রশাসনিক কাজে জ্ঞানলাভের, সরকারী পদমর্যাদার ও সরকারী মহলের ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই দ্বারকানাথ এই চাকরি গ্রহণ করে থাকবেন। অবশ্য দ্বারকানাথকে এই চাকরি গ্রহণ করার জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম (জমিদারি, ব্যবসায়, আইন উপদেষ্টা প্রভৃতি) পরিত্যাগ করতে হয় নি। বরং দেখা যায়, চাকরিরত অবস্থায় তিনি ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অবশ্য উক্ত পদ লাভে দ্বারকানাথের যোগ্যতা ছিল। কালেক্টর প্লাউডেন সাহেব স্বয়ং দ্বারকানাথের এই পদ লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "a native of very high character and respectability ; he has not been before employed in the service of government, but is a person of good education and fully qualified for the situation to which he is nominated."[১১] চাকরিতে উল্লেখনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় দ্বারকানাথ প্লাউডেন সাহেবের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। ছয় বৎসর সেরেস্তাদারের পদে বহাল থেকে দ্বারকানাথ ১৮২৮ সালের ১ ডিসেম্বর শুল্ক, লবণ ও আফিম বোর্ডের দেওয়ান পদে উন্নীত হন।* এ প্রসঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রনাথ

*Board of Customs, Salt and Opium ছিল কোম্পানি সরকারের পক্ষে তখন লবণের উৎপাদন ও পাইকারী ব্যবসার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। সে সময়ে লবণের ছ'টি এজেন্সী সে-সব জেলাগুলিতেই ছড়িয়ে ছিল যেখানে লবণ

লিখছেন: "দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্লাউডেনের নিকট কার্য করিতেছিলেন, সেই সময় নিমকি বোর্ডে তদানীন্তন দেওয়ানের অনেক টাকার তহবিল তছরূপ ঘটিল। পার্কার দেখিলেন সমস্ত নিমকি বিভাগের সম্পূর্ণ নূতন বন্দোবস্ত না করিলে এরকম ঘুষ, চুরি প্রভৃতির উপদ্রব কিছুতেই নিবারিত হইবে না। জমিদার, আইনজ্ঞ, কর্মদক্ষ ও ধর্মভীরু দ্বারকানাথের মতো আর দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তিকে এ কার্যে সহায় পাইবেন?"[১২] একথা সত্য যে, উক্ত বোর্ডের জুনিয়র মেম্বার হেনরি মেরিডিথ পার্কার-ই দ্বারকানাথকে দেওয়ান পদে সত্বর যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং এই নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী মন্তব্যে উল্লেখিত তছরূপ বা জুয়াচুরির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন।[১৩] কিন্তু দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে দ্বারকানাথকেও নানা বিরক্তিকর ও মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। দ্বারকানাথ ১৮৩৪ সালের ১ আগস্ট 'ব্যক্তিগত কাজের চাপে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার উদ্দেশ্যে'[১৪] দেওয়ান পদে ইস্তফা দেন। অবশ্য, দ্বারকানাথের পদত্যাগ পত্রের বয়ান কি ছিল তা জানা যায় না, তবু পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে ১৮৩৪ সালের ৭ আগস্ট তারিখে উক্ত বোর্ডের তরফ থেকে পার্কার দ্বারকানাথকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানে 'ব্যক্তিগত কাজের চাপ'-এর উল্লেখ রয়েছে। পার্কার লিখেছিলেন: "আপনার ১লা তারিখের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করছি। সে চিঠিতে আপনি আবগারী লবণ এবং আফিম বোর্ডের দেওয়ান হিসেবে যে-সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন সে-কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। কারণ ব্যক্তিগত কাজের চাপে সরকারী কর্মে এতটা সময় ব্যয় করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় বলে আপনি মনে

তৈরির জন্য নোনামাটি পাওয়া যেত। লবণ থেকে সরকারী আয়ের পরিমাণ ছিল জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরেই। (Blair Kling : Partner in Empire, Calcutta, 1981, p. 36).

করেছেন। এ ছাড়া যে-কাজের জন্য আপনি নিযুক্ত আছেন সে-কাজ আপনি নিজের তৃপ্তিমত সম্পন্ন করতে পারছেন না বলেই আপনার বিশ্বাস। আপনার চিঠি আমি বোর্ডের সামনে উপস্থিত করেছি। আপনার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে এ সংবাদ আপনাকে জানানোর জন্য বোর্ড আমাকে নির্দেশ দিয়েছে।* সঙ্গে সঙ্গে আপনার মত একজন কর্মচারীর কর্মত্যাগে তাঁরা যে দুঃখিত সে-কথা আপনাকে জানিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন।"[১৫]

চাকরিতে ইস্তফাদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাজের চাপের উল্লেখ প্রকাশ্যত বাস্তবসম্মত ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হলেও (কারণ দ্বারকানাথ সঙ্গে সঙ্গেই কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোং স্থাপন করেন) যেহেতু চাকরি কালে দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উঠেছিল সেজন্য প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, শুধুমাত্র কাজের চাপের জন্যই কি দ্বারকানাথ পদত্যাগ করেছিলেন? নাকি চাকরিরত অবস্থায় তাঁকে যে-সব গ্লানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে-সব ঘটনাবলীও তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল। দ্বারকানাথের সমগ্র চাকরি জীবনে তথ্যগতভাবে যে কয়েকটি অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রথম হল, ১৮২৪ সালে বিরাহিমপুর অঞ্চলে বাঁধের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১১৬ জন প্রজার বাঁধ গড়তে না দেওয়ার জন্য দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে নালিশ জানানোর ঘটনা। এই নালিশের বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ যে-যুক্তি দেখিয়েছিলেন সরকার এবং বাঁধ কমিটি (Embankment Committee) তা অগ্রাহ্য করে প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করেছিল।[১৬] দ্বারকানাথ যখন চব্বিশ-পরগনায় সেরেস্তাদার ছিলেন তখন আরও একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়— দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে একটি আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, নলুয়া গোলায় ন' হাজার মণ লবণ ঘাটতি হয়েছে, দ্বারকানাথ এই

*দ্বারকানাথের স্থলে ঐ দেওয়ান পদে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিযুক্ত হন।
(Blair Kling : Partner in Empire, Calcutta, 1981, p. 40).

ঘাটতির বিষয়ে জানেন এবং এর দ্বারা দ্বারকানাথ নিজে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু অনুসন্ধান কালে কোন ঘটতি নজরে না আসায় দ্বারকানাথ উক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।[১৭] আবার ১৮৩৩ সালে দ্বারকানাথ যখন দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত তখন চব্বিশ-পরগনার খাসপুর অঞ্চলের প্রজারা বেন্টিঙ্কের কাছে এই মর্মে নালিশ করে যে, তাদের পাষাণ-হৃদয় জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বে-আইনীভাবে খাজনা বৃদ্ধির অভিযোগের মামলায় কোর্টে হেরে গিয়ে প্রজাদের ওপর জোরজুলুম চালাচ্ছেন—কাউকে আটক করে কাউকে বা ভয় দেখিয়ে—কিন্তু যেহেতু উক্ত জমিদার ধনী ব্যক্তি সেজন্য কালেক্টর, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট কেউই তাদের কথায় কর্ণপাত করছেন না।[১৮] এক্ষেত্রে সরকার অভিযোগকারীদের কোর্টের দ্বারস্থ হতে বললেও দ্বারকানাথের আচরণ যে আইনসঙ্গত নয় তার উল্লেখ করেছেন।[১৮] ১৮৩৩ সালেই আবার দ্বারকানাথের সরকারী কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অভিযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। চব্বিশ-পরগনার বালন্দা আড়ঙ্গের কিছু মলঙ্গী* গোপীমোহন মল্লিক নামে এক শুল্ক দারোগার বিরুদ্ধে এই মর্মে নালিশ করে যে, চুক্তি অনু-সারে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ছ' হাজার টাকা দিতে হবে বলে ঐ দারোগা মলঙ্গীদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করে থাকে এবং এরূপ অন্যায় অর্থ আদায় 'দ্বারকানাথের বন্দোবস্ত' বলেই অভিহিত। এই অভিযোগের তদন্ত করার ভার পড়েছিল বারাসতের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর। কিন্তু তদন্তকালে উক্ত দারোগা জীবিত না থাকায় সাক্ষীর অভাবে দ্বারকানাথের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ না চাওয়ার কারণ দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন: আইনগত প্রমাণ না থাকলেও এমন সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, অভিযোগে

*লবণ উৎপাদনকারীদের মলঙ্গী বলা হতো; এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত কৃষক ছিল। লবণের এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা দাদন নিয়ে নোনামাটি থেকে লবণ তৈরি করাই ছিল এদের কাজ।

দ্বারকানাথের নামোল্লেখ অহেতুক নয়।[১৯] অবশ্য, বোর্ডের সিনিয়র মেম্বার সি. ডয়লি এবং জুনিয়র মেম্বার পার্কার উভয়েই উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দ্বারকানাথের ওপর আরোপিত সন্দেহকে স্বীকার করেন নি। পার্কার এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "অভিযোগ স্পষ্ট নয় এবং ইচ্ছা করলে দ্বারকানাথ লক্ষ লক্ষ টাকা বে-আইনীভাবে রোজগার করতে পারতেন, সে তুলনায় এ টাকার অঙ্ক নগণ্য, তা ছাড়া, তাঁর উচ্চ মানের চরিত্রের দৃষ্টান্তে সমস্ত বিষয়টি অসম্ভব ও বেদনাদায়ক। যেহেতু দ্বারকানাথ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী সেজন্য অধস্তন কর্মচারী লোভের বশে তাঁর নাম এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে। সর্বোপরি ব্রাহ্মদলের ও প্রগতি-পন্থী হিন্দুদের নেতারূপে দ্বারকানাথকে ব্রিটিশদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। তিনি এবং তাঁর মতো ব্যক্তিরাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যৌক্তিকতার দৃষ্টান্ত বহন করেন। যে সভ্যতার উন্নতি বিধান ব্রিটিশ সরকার তার প্রাথমিক লক্ষ্য বলে মনে করে তারই জন্য দ্বারকানাথের সুনাম রক্ষা করতে হবে। গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাসীদের আক্রমণ থেকে তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।"[২০] কিন্তু পার্কারের এ-সব সুপারিশ সত্ত্বেও বিষয়টি সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের দরবারে যায়; সেখানেও দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত না হওয়ায় অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে প্রেরিত হয়। ইণ্ডিয়া অফিস অবশ্য সমস্ত কাগজপত্র দেখে বলে যে, "full produce of the *aurang* had been returned by the darogha and under his *kabooleat* he was bound to deliver this amount."[২১] সুতরাং ইণ্ডিয়া অফিস মনে করে যে, এই অভিযোগ মিথ্যা এবং শুধু দ্বারকানাথ নন, দারোগাও সম্পূর্ণ নির্দোষ।[২১] এর ফলে, শেষ পর্যন্ত কাগজপত্রে দ্বারকানাথের সুনাম রক্ষা এবং দ্বারকানাথের মতো ব্যক্তিদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সমর্থন ব্যক্ত হল বটে, কিন্তু জনচিত্তে দ্বারকানাথ সম্পর্কে অপবাদের গুঞ্জন অপসৃত হয় নি। কেননা, দেখা যায়,

ক্ষিতীন্দ্রনাথ দুর্নাম রটার বিষয় উল্লেখ করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিল জীবিকার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এবং ধর্মসভার সমর্থকেরা।[২২] পার্কার সাহেবও দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের জন্য ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের দায়ী করেছিলেন। ব্লেয়ার ক্লিঙ এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, দলীয় বা ধর্মীয় ভাবে বিরোধীরা অভিযোগকারী বলে গণ্য হতে পারে বটে, কিন্তু পার্কার দলীয় ও ধর্মীয় কারণকে এ বিষয়ে বড় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্লিঙের অভিমত হল, মলঙ্গী ও অধস্তন কর্মচারীদের কাছে 'Dwarkanath was too much a man of the Raj'[২৩] এবং মলঙ্গীরা নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে অনেক সময় বে-আইনীভাবে লবণ প্রস্তুত করত, এ কাজে আইনের হাতে ধরা না পড়ার জন্য তারা ঘুষও দিত। এমত অবস্থায় সরকারের আয় বৃদ্ধিতে ও সন্তোষ বিধানে তৎপর দ্বারকানাথ লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় অন্যায় কার্যাদির প্রতিবন্ধক হয়েছিলেন বলে তাঁকে মলঙ্গীরা সরাতে চেয়েছিল।[২৪] দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েও কিন্তু ক্লিঙ নিশ্চিত নন যে, দ্বারকানাথ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনে তাঁর পদের সুযোগ গ্রহণ করেন নি। (It cannot be known for certain whether or not Dwarkanath used his position as dewan for personal gain."[২৪] নিশ্চিত না হয়েও ক্লিঙ মন্তব্য করেছেন: ছোটখাটো চুরি দ্বারকানাথের চরিত্রের সঙ্গে বেমানান এবং বড় ধরনের চুরি আবিষ্কৃত হওয়ারই সম্ভাবনা।[২৪] অথচ ক্লিঙ-ই আবার এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, জোর করে অর্থ আদায়ের সব রকম সুযোগই দ্বারকানাথের ছিল এবং দ্বারকানাথ বেশ ধনী ব্যক্তি হয়েই চাকরি থেকে বেরিয়ে আসেন।[২৪] সুতরাং প্রশ্ন জাগে, চাকরিরত অবস্থায় দ্বারকানাথের বে-হিসাবী ধনী হওয়ার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি বলেই কি ক্লিঙ এ ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন? বাস্তবেও দেখা যায়,

চাকরি কালে জমিদারি ক্রয়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, ফেল-পড়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ ও চাকরি পরিত্যাগ কালে 'কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে দ্বারকানাথ বহু লক্ষ টাকা বিনিয়োগে সমর্থ হয়েছিলেন।* সুতরাং নানা কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত দ্বারকানাথের পক্ষে চাকরিতে ইস্তফা দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাজের চাপের উল্লেখ অবাস্তব না হলেও চাকরিরত অবস্থায় পূর্বোক্ত অভিযোগসমূহের জন্য যে গ্লানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাও দ্বারকানাথকে পদত্যাগের পথে নিয়ে গিয়েছিল, একথা ভাবা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

দ্বাবকানাথের চাকরি ত্যাগ প্রসঙ্গে একটি পরোক্ষ কারণের উল্লেখ করা যায়। দেওয়ান দ্বারকানাথ বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে একবার সপরিবার লর্ড বেন্টিঙ্ককে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সেখানে বেন্টিঙ্ক নিজে অনুপস্থিত থেকে লেডী বেন্টিঙ্ককে পাঠিয়ে দেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখছেন, বেন্টিঙ্ক "নিজে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ এই বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যখন নিজেব কৌন্সিলের মেম্বারদিগেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন না তখন দ্বারকানাথ নিমকিবোর্ডেব দেওয়ান কর্ম্মে থাকিতে অর্থাৎ অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকিলে স্বাধীনভাবে সকলের মিশিতে পারা যাইবে না—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার মনুষ্যোচিত প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করিবে না।"[২৫] ক্ষিতীন্দ্রনাথের মতে, "ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে মেলামেশায় স্বাধীনতা না থাকিলে দেশের মঙ্গল

* "তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য্য হইতে অবসৃত হন ; এবং 'কার টেগোর এণ্ড কোং' নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৬।)

করিতে পারা যাইবে না। এই সকল ভাবিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন"।[২৬] মর্যাদাভিলাষী দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে চাকরি ত্যাগের সঙ্কল্পের একটি পরোক্ষ কারণ বলে মেনে নিয়েও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, চাকরিরত অবস্থায় দ্বারকানাথ যে মর্যাদাহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল। আর এই উৎকণ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায় দ্বারকানাথের কাছে প্রেরিত হেনরি মেরিডিথ পার্কারের অন্য একটি চিঠিতে। দ্বারকানাথের এক চিঠির উত্তরে পার্কার ১৪ অক্টোবর ১৮৩৪ তারিখের পত্রে লিখছেন: "বন্ধুত্বের খাতিরে আমি আপনার জন্য সামান্য যা কিছু করেছি তাকে আপনি এত বাড়িয়ে বলেছেন দেখে আমি বাস্তবিকই লজ্জা অনুভব করি। বন্ধুত্ব ছাড়াও আপনার সাধুতা এবং মহৎ চরিত্রের জন্য বিবেকের খাতিরে আমি এ না করে পারতাম না। বাস্তবিক এ কথা আমি মন থেকেই বলতে পারি যে, যে-বিচিত্র পরিস্থিতিতে কার্যোপলক্ষে আপনি অবস্থান করছিলেন তখন আপনার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত কাপুরুষোচিত এবং প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু করবার জন্য যদি আমি নিমিত্তমাত্র হই, তা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমার পদমর্যাদার জন্যে।"[২৭] সরকারী কর্মত্যাগের পরেও দেখা যায় প্লাউডেন ও পার্কারের সঙ্গে দ্বারকানাথের অতিশয় সহৃদয় সম্পর্ক বজায় ছিল, উভয়েই ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও সামাজিক পরিবেশে দ্বারকানাথের সহচর ছিলেন।

॥ জমিদারি / নীলকুঠির মালিকানা ॥

দ্বারকানাথের জমিদারি কেনার সন-তারিখ সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, তবে তিনি যে চাকরিতে এবং ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা কালেও জমিদারি কেনা বন্ধ রাখেন নি তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কালীগ্রাম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এবং সাহাজাদপুর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে

এবং অন্যান্য জমিদারীও এই সময়ের কাছাকাছি কেনা হইয়াছিল। এইরূপে চাকরী করিবার মধ্যেই অনেক জমিদারী কিনিয়া এক বিস্তৃত ভূম্যধিকারী হইয়া বসিলেন।"[২৮] কিশোরীচাঁদের মতে, "ব্যবসা শুরু করবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি নিম্নলিখিত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন: রাজশাহীতে—কালীগ্রাম, পাবনায়—শাহাজাদপুর, রংপুরে—স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাট এস্টেটের—তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী জগদীশপুর, যশোহরে—মহম্মদশাহী, কটকে—শেরগড়।"[২৯] এ ছাড়, দেখা যায়, চব্বিশ-পরগনার খাসপুর ও পাবনার মোহনগঞ্জও দ্বারকানাথের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। দ্বারকানাথের উইলে ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর ও হুগলী অঞ্চলের সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩০] পৈতৃক জমিদারির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জমিদারির আয় সংক্রান্ত হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৪ সালে ভূসম্পত্তি থেকে বৎসরে ১,৩০,০০০ টাকা আয় হতো।[৩১]

যা হোক, এই বিস্তৃত জমিদারি দ্বারকানাথ কীভাবে পরিচালনা করতেন সে বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারকানাথের পৈতৃক জমিদারি বিরাহিমপুরের প্রজারা একবার বিদ্রোহী হয়ে খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে নালিশ জানিয়ে প্রতিবিধান প্রার্থনা করে।[৩২] ম্যাজিস্ট্রেট বৃত্তান্ত শুনে প্রজাদের পক্ষাবলম্বনে অগ্রসর হলে দ্বারকানাথ নিজে রায়তদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হন। দ্বারকানাথের হাতে ছিল উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের অতীত কার্যাবলীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কিছু নজীর। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট যখন দ্বারকানাথের ইচ্ছানুসারে প্রজাদের দমন করতে অস্বীকার করলেন তখন দ্বারকানাথ ঐ সকল নজীর উত্থাপন করে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখালেন। এর ফলে দ্বারকানাথ উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে স্বপথে আনতে সক্ষম হন এবং বিক্ষুব্ধ প্রজাদের দমন করা সহজ হয়।[৩৩] বিরাহিমপুরের ক্ষুব্ধ

প্রজারা তা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই জমিদারকে উত্যক্ত করে চলেছিল। কেননা ১৮৩৬ সালে ঐ জমিদারির রায়তদের 'শায়েস্তা' করার জন্য দ্বারকানাথ এস. এফ. রাইস নামে একজন ইংরেজকে সেখানকার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ঐ বছরই এপ্রিল মাসে প্রজারা একজোট হয়ে যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 'ইস্তফা' দিতে শুরু করে। ইস্তফা দানকারী প্রজাবৃন্দ তাদের জমিদারের বিরুদ্ধে কী জাতীয় অভিযোগ এনেছিল তার সঠিক তথ্য অবগত হওয়া না গেলেও অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ভিটে-মাটি ছাড়ার ঝুঁকি খুব সহজ কারণে কেউ নেয় না। সুতরাং নিরুপায় হয়েই প্রজারা রায়তী সম্পর্ক ছিন্ন করতে অগ্রসর হয়েছিল। এভাবে 'ইস্তফা' চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত কোন রায়ত অবশিষ্ট থাকবে না এরূপ আশঙ্কা থেকেই, বোধ হয়, দ্বারকানাথ ম্যানেজার রাইসকে আবেদনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন এবং জানতে চান নীলের গোমস্তারা বা জমিদারির আমলারা সত্যই প্রজাদের নিপীড়ন করছে কিনা।[৩৪] দ্বারকানাথ শুধু বিরাহিমপুরেই সাহেব ম্যানেজার নিয়োগ করে স্বস্তি পান নি, দেখা যায়, ১৮৩৬ সালেই আবার শাহাজাদপুরের জন্যও সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে। সেখানকার ম্যানেজার জে. সি. মিলারকে লিখিত এক চিঠিতে দ্বারকানাথ নীলকুঠি স্থাপনের কথা লিখেছেন এবং উক্ত চিঠিতে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে খাজনার রদ-বদল করতেও বলেছেন। পতিত জমিকে চাষের আওতায় এনে রায়তদের বসতি দেবার জন্য কিছু খাজনা এমন ভাবে ত্যাগ করতে বলেছেন যাতে ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা থাকে। এই চিঠিতে বে-দখল জমির পুনর্দখল করার নির্দেশও ছিল।[৩৫] প্রজাদের সুখ-দুঃখ বা উন্নতির জন্য জমিদারের কোন চিন্তা-ভাবনার কথা এই চিঠিতে উল্লেখিত হয় নি বলে কৃষ্ণ কৃপালনি মন্তব্য করেছেন: "This comparative indifference is in marked contrast to the very genuine concern for the welfare of the tenantry in his grandson Rabindranath's

letters written six decades or more later,......"[৩৬] দ্বারকানাথের অন্তরে প্রজার কল্যাণ চিন্তার অভাব কৃপালানিকে পীড়া দিলেও তিনি দ্বারকানাথ কর্তৃক সাহেব কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দ্বারকানাথ কর্তৃক সাহেব কর্মচারী নিয়োগের কারণ ব্রিটিশদের দক্ষতা ও সততায় দ্বারকানাথের শ্রদ্ধা ছিল এবং দ্বারকানাথ যে-ভাবে তাঁর জমিদারিকে নীল, চিনি, রেশম প্রভৃতি উৎপাদন কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেজন্য উচ্চ মানের যোগ্যতাসম্পন্ন সাহেব কর্মচারী বেশী বেতনে নিযুক্ত করা দ্বারকানাথের মনে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল।[৩৭] কিন্তু প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, লালমুখ ও নীলচোখের উপস্থিতির মধ্যে শাসকজাতির যে ধৃষ্টতা প্রকাশ পেত তাকে স্বার্থানুকূল কাজে লাগানোর প্রশ্নটি এক্ষেত্রে অবান্তর ছিল না। কেননা সাহেব কর্মচারীর সততা ও দক্ষতার স্বাক্ষর সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, বরং শাসকজাতি হিসেবে অন্যায় ও অত্যাচার করায় ইংরেজরা যে অভ্যস্ত ছিল তার নজীরের অভাব নেই। আর সে কারণেই বোধ হয়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহেব কর্মচারী নিয়োগ প্রসঙ্গে প্রজাদেরকে 'শায়েস্তা' করার কথাই উল্লেখ করেছেন।[৩৮] তা ছাড়া, জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণে দ্বারকানাথের কঠোর বৈষয়িক মনোভাবের দৃষ্টান্ত শুধু তাঁর নিজ প্রজাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অন্য জমিদারদের সঙ্গেও তাঁর আচরণ অনমনীয় ছিল। যেমন, শাহাজাদপুর জমিদারি নীলামে ক্রয় করার পর দ্বারকানাথের কাছে ঐ জমিদারির উত্তরাধিকারীরা (জমিদারের মাতা সহ) নির্দিষ্ট খাজনায় একটা বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য দ্বারকানাথের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন; কিন্তু দ্বারকানাথ তাঁদের প্রার্থনা নাকচ করে তাঁদেরকে উক্ত জমিদারি থেকে উৎখাত করে দেন।[৩৯] উপরি উক্ত নানা দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে জমিদার দ্বারকানাথ সম্পর্কে ব্লেয়ার ক্লিঙের মন্তব্যকেই সমর্থন করতে হয়—"As a zamindar Dwarkanath was mercilessly efficient and

businesslike, but not generous."[৪০]

তৎকালে জমিদার কর্তৃক প্রজা-পীড়নের ঘটনাবলী সম্পর্কে দ্বারকানাথ যে অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীলকর বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের বিবৃতি থেকে। নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষের জন্য অন্য চাষাবাদের ক্ষতি হচ্ছে বলে যখন চারদিকে নীলচাষ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায় তখন দ্বারকানাথ পত্রিকা মারফৎ এদেশীয় জমিদারদের প্রজা-নিপীড়নের কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ তারিখের 'সংবাদ কৌমুদী'-তে 'একজন জমিদার' নামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। "এই 'একজন জমিদার' আর কেউ নয়, স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর।"[৪১] দ্বারকানাথ উক্ত পত্রে লিখেছিলেন: "এ দেশে যাঁর ভূমম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারী দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে একথা সুবিদিত যে নীল-চাষের জন্যে কী বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীল-চাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্নশ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে।...এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মর্জি দ্বারা নির্যাতিত হয় না।" উক্ত পত্রে দ্বারকানাথ আরও বলেছিলেন যে, "সরকারের নিকট অনুসন্ধানপরায়ণ বিচারকরা সময় সময় যে রিপোর্টগুলি দাখিল করেছেন তা দেখলেই রায়তদের প্রতি জমিদারদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে। তাছাড়া এমন অনেক জমিদার আছেন যাঁরা কচিৎ নিজের জমিদারী পরিদর্শনে যান। ম্যানেজারের উপরই তাঁদের যত বিশ্বাস, তার উপরই চাষাবাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। সাধারণত ম্যানেজারেরা বিশ্বাসের অপব্যবহার করে এবং নিজেদের সুবিধার জন্য রায়তকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত করে। তারা ভয় দেখিয়ে এবং জোরজবরদস্তি করে চাষীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করায় অনেক চাষী গ্রামান্তরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে চাষীদের বাসস্থান খালি পড়ে থাকে, জমি পতিত

হয়ে যায়। ম্যানেজারেরা তাদের মনিবের কাছে যে মিথ্যা অজুহাত দেয় তা হচ্ছে এই যে নীলকরদের অত্যাচারে খাজনা কমে যাচ্ছে, চাষ হচ্ছে না।"[৪২] দ্বারকানাথের এই বিবৃতি অনুসরণ করে সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন: "দ্বারকানাথ নিজে একজন প্রভূত সম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে জমিদারদের দুষ্কর্মের সাফাই গাইবার কোন প্রয়াস করেন নি দ্বারকানাথ অকপটভাবে তিনি প্রজাদের উপর জমিদারদের ও জমিদারদের কর্মচারীদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বর্ণনা করেছেন।"[৪৩] বস্তুত দ্বারকানাথের এই সত্যনিষ্ঠা ও অকপট বর্ণনা প্রশংসার হতো যদি দেখা যেত যে, এ বিষয়ে তাঁর নিজের স্বার্থ একেবারেই জড়িত ছিল না। দ্বারকানাথ নিজে জমিদার হিসেবেও যে এই ধরণের অত্যাচার মুক্ত ছিলেন না তার প্রমাণ পূর্বোল্লিখিত ঘটনাবলীতেই রয়েছে। সওয়াল-জবাবের রীতিতে অভ্যস্ত দ্বারকানাথ খুব কৌশলে জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরে নীলচাষের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন। নীলের আবাদ অব্যাহত রাখার এবং নীলকরদের সমর্থন করার পশ্চাতে জমিদার দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ স্বার্থও ছিল, কারণ নীলচাষভুক্ত জমি থেকে উচ্চ হারে খাজনা বা ভাড়া আদায় করা যেত। ("The Zamindars often enjoyed higher rents from the lands sown with indigo—a fact which might have brought Rammohun and Dwarkanath to the defence of the system")[৪৪] তা ছাড়া অবাধ বাণিজ্য ও ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়িভাবে বসবাসের (Colonization) সমর্থকরূপে রামমোহন-সহযোগী দ্বারকানাথ নীতিগতভাবেও নীলকরদের উৎখাত আন্দোলনের সহায়ক হতে পারেন নি। দেখা যায়, ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় (Colonization-এর প্রশ্নে) দ্বারকানাথ ও রামমোহন নীলকরদের সমর্থনসূচক অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেছিলেন: "I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have

considerably benefited the country and the community at large, the Zamindars becoming wealthy and prosperous, the Ryots materially improved in their condition and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced and cultivation rapidly progressing."[৪৫]

দ্বারকানাথের বক্তব্য সমর্থন করে রামমোহন রায় বলেছিলেন: "As to the Indigo planters I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Bihar and I found the natives residing in the neighbourhood of Indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the Indigo planters, but on the whole, they performed more good to the generality of the natives of this country, than any other class of Europeans, whether in or out of the Service"[৪৫]

নীলকরদের সম্পর্কে রামমোহন-দ্বারকানাথের উদ্ধৃত বক্তব্যের মধ্যে যেন লর্ড বেণ্টিঙ্করই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। ১৮২৯ সালের ৩০ মে তারিখে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের কাছে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে বেণ্টিঙ্ক লিখেছিলেন: "নীলকরদের কখন-সখনো দুর্ব্যবহার তারা যে কল্যাণ চারিদিকে বিতরণ করেছেন তার তুলনায় কিছুই না। অন্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও যেটা ক্বচিৎ কদাচিৎ ঘটে সেটা এমন মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে তাকে অবস্থাব সাধারণ গতি বলে ভুল করা হয়েছে। শান্তি ভঙ্গের ব্যাপার স্বাভাবিকতই সাধারণের গোচরে আনা হয়, ব্যক্তিগত দুর্ব্যবহারের উদাহরণ ভীষণ রং চড়িয়ে সকলের সামনে হাজির করা হয়, কিন্তু যে সব অসংখ্য নামহীন কাজ, নীরবে নিজেদের কাজ করতে ব্যস্ত, বিজ্ঞ ও সংযত ব্যক্তিরা জাতীয় সম্পদ এবং চারপাশের লোকদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলবার জন্যে করে চলেছেন

সে সব কাজ গোচরে আসেনা এবং অজ্ঞাতই থাকে। নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের অনেক জেলায় কৃষির যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে তার কারণ নীলকরদের সেখানে বসতি।"[৪৬]

নীল চাষ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত জমিদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে একমত হওয়া যে দ্বারকানাথের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না তা নীলচাষের সঙ্গে জড়িত দ্বারকানাথের ভূমিকা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। নীলের চাষ এবং নীলকুঠি স্থাপনে দ্বারকানাথ অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর জমিদারি নীল-আবাদের অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র ছিল। ১৮২১ সালে তিনি প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন পাবনা জেলার শিলাইদহতে। ক্রমে তিনি সাতটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। এই নীলকুঠিগুলির মধ্যে পাঁচটি ছিল পাবনা-নদীয়ার বিরাহিমপুর ও শাহাজাদপুর জমিদারি অঞ্চলে এবং মুর্শিদাবাদের বড় জঙ্গীপুরে ও ছোট জঙ্গীপুরে একটি করে। দ্বারকানাথ তাঁর কারখা.য় নীলেব যোগান লাভে অন্য নীলকবদের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। নীল-চাষের ব্যাপারে নীলকবেরা রায়ত ও অন্য জমিদারের প্রজাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু দ্বাবকানাথের রায়তী ব্যবস্থায় চাষীরা নিজেরাই বীজ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে চাষ করত এবং নিরীহ-বাধ্য-প্রজাচাষীদের কাছ থেকে দ্বারকানাথ যে নীল সরবরাহ পেতেন তা ছিল অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত। একটা আনুমানিক হিসাবে বলা হয়েছে দ্বারকানাথের সাতটা কুঠিতে বছরে প্রায় ষোল শ' মণ নীল উৎপন্ন হতো যা থেকে কলকাতায় বসে তিনি দু' লক্ষ টাকার মতো পেতেন।[৪৭] তা ছাড়া দ্বারকানাথের রপ্তানী বাণিজ্যে নীল অন্যতম স্থান অধিকার করেছিল। নীল ব্যবসায়ের লগ্নীতে দ্বারকানাথ পরিচালিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার টেগোর কোং কী ভাবে জড়িত ছিল সে বিষয়ে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা কবা হয়েছে। সুতরাং এখানে সে আলোচনা উহ্য রেখে নীলচাষের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সংশ্লিষ্টতা কত প্রবল ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত

নীল কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডার ফরবস্ নামে দ্বারকানাথের জমিদারির একজন ম্যানেজার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে দ্বারকানাথ এমন বেশী অর্থ দাবি করতেন যা ইজারাকৃত অঞ্চল থেকে নীলকরদের লভ্য হতো না। যেমন, Hizlabut প্রতিষ্ঠানকে দশ হাজার টাকায় দ্বারকানাথ যে জমি ইজারা দিয়েছিলেন সেখান থেকে তাদের আয় সাত হাজার টাকার বেশী হয় না। তবু যে তারা এরূপ ইজারা নিত তার কারণ নীল উৎপাদন করে তারা ক্ষতিপূরণ করার আশা রাখত। তা ছাড়া, দ্বারকানাথ অনেক সময় ভয় দেখিয়েও ইজারার বন্দোবস্ত করতেন। যেমন একসময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দ্বারকানাথ একটা অঞ্চল ইজারা নিতে বাধ্য করেন এই বলে যে, ইজারা না নিলে নৌকার মাঝি ও মালবাহী গাড়ীর গাড়োয়ানদের কাজ করতে না দিয়ে দ্বারকানাথ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ফ্যাক্টরী থেকে মাল চলাচল বন্ধ করে দেবেন।[৪৮] বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথের জমিদারি সংলগ্ন নীলের কুঠিওয়ালাদের এরূপ ভয় দেখানোর ক্ষমতা দ্বারকানাথের ছিল।

অথচ, তৎকালের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়পুষ্ট নীলকর সাহেবরা অতিশয় নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচারে অভ্যস্ত ছিল। আর নীলকররা অত্যাচারের সাহস সংগ্রহ করেছিল তৎকালের শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও। কারণ, ১৮৩০ সালের পঞ্চম রেগুলেশন অনুসারে নীলকররা সাধারণ বিচার পদ্ধতির আওতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল।[৪৯] নীলকরদের অনুকূলে এই আইন সদাশয় বলে বর্ণিত লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইন অনুসারে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে নীলচাষীকে কয়েদ করা যেত এবং ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষেত্র বিশেষে নীলচাষীকে নীলের আবাদ করতে বাধ্য করতে পারত। বস্তুত এ আইন যখন জারি করা হয়েছিল তখন চারদিকে নীলকর বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছিল এবং বাণিজ্যিক সঙ্কটাবর্তে নীলকরদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। সেজন্য

নীলকরদের উদ্ধারকর্তা রূপে বেন্টিঙ্ক উক্ত আইন প্রবর্তনে যে সক্রিয় হয়েছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তী কালে (১৮৫৪) পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট বোফার্ট-এর মন্তব্যে: "Probably William Bentinck saved indigo property in Bengal from utter destruction by passing the regulation in question."[৫০] কিন্তু নীলকরদের এরূপ আইনের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা করার বিরুদ্ধে তৎকালের প্রগতিশীল নেতৃত্বের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় নি, এটা সত্যই বিস্ময়কর। এসব কারণেও নীলকরদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল—প্রজাদেরকে অন্যায়ভাবে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করা ছাড়াও নীলের দাদন নিতে প্রজাদের বাধ্য করার জন্য জাল-জুয়াচুরি, প্রজাদের আটক ও তাদের ওপর দৈহিক নির্যাতন, নারী-নিগ্রহ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল আচরণে নীলকর সাহেবরা এত অভ্যস্ত ছিল যে সেই সময়ে গ্রামবাংলায় নীলকর ও নীলকুঠির আমলাদের লোকে সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে করত।[৫১] দ্বারকানাথের মতো এদেশীয় জমিদারদের উপরি উক্ত লোভ মেটানোর চাপে এই নীলকরেরা যে অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মাত্রা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে থাকবে তা আর বিচিত্র কি! সম্ভবত এরূপ চিন্তা থেকেই ব্লেয়ার ক্লিঙ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, —"Dwarkanath must be included among those zamindars who contributed to the oppressive nature of the indigo system[৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিহাসবেত্তা ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন* যে, দ্বারকানাথ নীল উৎপাদন ও

* "Cultivation of indigo was inseparable from the oppression of the ryot. But the efficiency of the indigo planters is reported to have created a great impression on the mind of Dwarkanath Tagore. He himself became an indigo planter and owner of several indigo factories. As a director of the Union Bank he became associated with the financing of indigo business. But it did not take him a long time to become

ব্যবসায়ে নীলকরদের সাফল্য দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং নিজে নীলচাষ ও নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তবে রায়তদের অত্যাচার না করে যেহেতু নীলের চাষ লাভজনক রাখা যাবে না সেজন্য তিনি নীলের ব্যবসা ত্যাগ করেন।[৫৩] ঐতিহাসিক ড. সিংহ যে সূত্র উল্লেখ করে (সোমপ্রকাশ, ১৪ বৈশাখ ১২৭.) এই তথ্য পরিবেশন করেছেন সেই সূত্রানুসারে বিষয়ের অবতারণায় ভুল রয়েছে। কারণ, দ্বারকানাথ নন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীলকুঠি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রজার ক্রন্দনে জমিদারের কর্ণপাত করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত তারিখের 'সোমপ্রকাশ'-এ সম্পাদকায়তে লেখা হয়েছিল: "জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার একটি প্রধান প্রমাণ। বিনা অত্যাচারে নীল হয় না বলিয়া তিনি কুঠী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম, তিনি কর্মচারিগণকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়াও অত্যাচারের নিবারণে সমর্থ হন নাই। সুতরাং কুঠী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"[৫৪] দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে নীলকুঠি বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তাঁর মৃত্যুর পরও যে ছ'টি নীলকুঠি বজায় ছিল তার উল্লেখ দ্বারকানাথের উইলেও রয়েছে এবং সেই উইলের বিষয় ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে।[৫৫]

উপরি উক্ত তথ্যাদি থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ যে যোগ্যতা ও সাফল্য অর্জন

---

convinced that without oppressing the indigo ryots indigo business could not be carried on. He instructed his employees in indigo factories not to oppress the ryots under any pretext. But when he became convinced that indigo business could not become profitable in some of his marginal factories without oppression of the ryots he gave up these factories." (N. K. Sinha : The Economic History of Bengal, Vol. III, Calcutta, 1970, p. 22 & f.n.[53] *Somprokash*, 14 Baisakh 1271, No. 24.)

করেছিলেন তার পশ্চাতে তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজ সাহচর্যের অবদান ছিল। তা ছাড়া, এটাও স্পষ্ট হয় যে, দ্বারকানাথের বৈষয়িক উন্নতির স্পৃহা একদিকে যেমন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে ও স্বার্থচেতনায় তন্ময়, অন্যদিকে তেমনি কঠোরতায় নির্মম ছিল। অবশ্য, ভাগ্যোন্নতির প্রশ্নে সদসৎ বা শুভাশুভ পন্থার বিচারে যারা অনাগ্রহী তাদের কাছে সাফল্যই বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে গণ্য হয়ে থাকে। দ্বারকানাথের মধ্যে এরূপ বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। পূর্বে উল্লেখিত 'একজন জমিদার'-এর চিঠিতে অত্যাচারিত রায়ত বা প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে দ্বারকানাথের সচেতনতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এই সচেতনতাব প্রকাশ যে কুম্ভীরাশ্রু মাত্র ছিল তার সাক্ষ্য মেলে উক্ত চিঠি লেখার চোদ্দ বছর পরে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হরকরা'-র এক সম্পাদকীয়তে। সেখানে জমিদার দ্বারকানাথ সম্পর্কে লেখা হয়: "আমরা এমন কথা শুনেছি বলে স্মরণ করতে পারি না যে .....তিনি (দ্বারকানাথ) তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্নতর। তাঁর প্রতিবেশী জমিদারির রায়তদের থেকে তাঁর জমিদারির রায়তরা কি বেশী সুখী—তিনি কি খেটে-খাওয়া মানুষদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য বেশী কিছু করেছেন—যা সামগ্রিকভাবে জমির দেশীয় মালিকদের জমিদারিতে অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও বলপ্রয়োগে আদায় করার মাত্রাকে হ্রাস করতে পারে—তিনি কি সৃষ্টি করতে পেরেছেন প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা রমণীয় দৃশ্য—সুখী প্রজাকুল?" (বেঙ্গল হরকরা, ৬ জানুয়ারি ১৮৪৫)[৫৬]

॥ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দ্বারকানাথ ॥

দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারির উত্তরাধিকার ও ভোগদখল সব কিছুই লাভ করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে জমিজমার ক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীল ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু স্থিতিশীল সম্পর্ক বিধিগতভাবে সরকার-জমিদারদের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমিদার ও রায়ত-কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণায়ক স্থায়ী বিধি এর দ্বারা রূপায়িত হয় নি বলে জমিদারদের খামখেয়ালির ওপরই রায়ত-কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করত। ব্রিটিশ সরকার মূলত জমিদারদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের প্রতি সরকার প্রশ্রয়দাতার বা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করত। বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যিক শাসনকেই চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। এই ব্যবস্থার প্রবর্তক স্বয়ং লর্ড কর্ণওয়ালিশ এ বিষয়ে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছিলেন : "In case of a foreign invasion, it is a matter of the last importance, considering the means by which we keep possession of this country, that the proprietors of the lands should be attached to us from motives of self-interest."[৫৭] শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ়তর ভিত্তিভূমি দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরকার ভূসম্পত্তি থেকে আয় সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল এবং এদেশে সাম্রাজ্যসীমা বৃদ্ধির জন্য খরচের যোগান অব্যাহত রাখতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সহায়ক হয়েছিল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত The Economic History of India'-র পাতায় এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : "It is not an exaggeration to state that Bengal, with its Permanent Settlement, yielding a steady and unvarying income from the soil, enabled the British nation to build up their Indian Empire."[৫৮] বস্তুত লর্ড ওয়েলেসলী থেকে লর্ড হেষ্টিংস পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর হয়েছে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত আয় থেকে। ("It may therefore be said with strict, truth that the conquests of Lord Hastings, like the conquests of Lord Wellesley, were made out of resources furnished by Permanently Settled Bengal.")[৫৯] ব্রিটিশ শাসকদের ভারত শোষণের লিপ্সা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিররুগ্ন করে রাখার ঔপনিবেশিক চক্রান্তেরও সাক্ষ্য বহন করে ক্রমাগত ভারতের স্কন্ধে চাপানো ঋণের হিসাব। ভারতের স্কন্ধে এই ঋণের বোঝা ১৭৯২ সালে ছিল যেখানে সত্তর লক্ষ পাউণ্ডের মতো, ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪৪-৪৫ সালে হয়েছিল চার কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড।[৬০] এই ঋণের বোঝা এতই জবরদস্তিমূলক ছিল যে, লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান যুদ্ধের খরচ ভারতের ঘাড়ে চাপানোতে তৎকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও বিলাতে গৃহীত সরকারী নীতির প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল।[৬১]

দ্বারকানাথ যখন স্বহস্তে জমিদারির কার্য পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন প্রজা-কৃষক সাধারণের অবস্থা যথেষ্ট শোচনীয় ছিল। ১৮১৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস তাঁর এক প্রতিবেদনে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "এই সমস্ত প্রদেশের প্রায় সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বেদনাদায়ক অত্যাচারের অধীন করেছে; এই অত্যাচার আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্বারা এমনভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে অত্যাচারিতের কষ্ট লাঘবে আমরা অসমর্থ।" (Lord Hastings in a minute written in 1819, admitted that the Permanent Settlement had "subjected almost the whole of the lower classes throughout these provinces to most grievous oppression; an oppression too so guaranteed by our pledge that we are unable to relieve the sufferers.")[৬২] আর হেস্টিংসের এই প্রতিবেদনে যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে ১৮২৮-এর ৩ নং রেগুলেশন আইনের অধীনে লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমিতে কর বসানোর দ্বারা উক্ত প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করা হয়েছে বলে বাংলা ও বিহারের হিন্দু-মুসলমান জমিদার শ্রেণী সরকারী নীতির প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। স্থিতাবস্থার স্বার্থে আঘাত পড়ায় জমিদার শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে। সরকারের নিকট প্রথমে পঞ্চান্ন জন জমিদারের (অধিকাংশই

ছিল হিন্দু) স্বাক্ষরিত আবেদন যায় ; দ্বিতীয়টি ছিল বিহারের একশ' কুড়ি জন (অধিকাংশ মুসলমান) জমিদারের স্বাক্ষরিত ; তৃতীয় আবেদন করা হয়েছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারদের পক্ষ থেকে —প্রথমে স্বাক্ষরবিহীন অবস্থায়, পরে দু' শ নয় জন জমিদারের স্বাক্ষর যুক্ত করে ঐ আবেদন প্রেরিত হয়।[৬৩] সরকারের নিকট এই প্রতিবাদ-আবেদনে রক্ষণশীল গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত প্রগতিশীল ব্যক্তিরা পারস্পরিক নীতি-বিরোধ ভুলে গিয়ে একত্র স্বাক্ষর দানে সামিল হয়েছিলেন। আরও পরে ১৮৩৭-৩৮ সালে দ্বারকানাথের মুখ্য ভূমিকায় জমিদারদের সভা বা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই প্রতিবাদ যে সাংগঠনিক রূপ লাভ করেছিল তারই মাধ্যমে সমবেত জমিদার শ্রেণী লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে আবেদন করে উক্ত আইনের পরিবর্তন ঘটানোর এবং সরকার কর্তৃক নতুন করনীতি গ্রহণ করানোর ব্যাপারে সামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্যের পশ্চাতে জমিদারদের স্বার্থসচেতন একতাই যে যথেষ্ট ছিল একথা মেনে নেওয়া যায় না যখন দেখা যায় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহও কম ছিল না। তৎকালে ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ ব্যক্তিরাও জমিদারদের সম্পর্কে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটিতে অনুকূল সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের একজন উচ্চস্থানীয় সহকারী (Senior Assistant Examiner) টমাস্ পীকক্ ঐরূপ এক সাক্ষ্যে বলেন : "ভারত সাম্রাজ্যে আমাদের স্থায়িত্ব অসিবলের স্থায়িত্ব। জনমতের যে একাংশ আমাদের সামরিক শক্তির সহায়তা করে থাকে তা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদারদের সেই অভিমত যে তাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। এর বাইরে আমাদের অনুকূলে কোন জনমতের অস্তিত্ব নেই।" ("...our tenure of our Indian empire is the tenure of the sword. There is only one portion of

public opinion in India that comes in aid of...our military power, and that is the opinion of the Zamindars under permanent settlement that their interests are identified with ours. Beyond this there is no public opinion that works in our favour.")[৬৪] এই প্রসঙ্গে বাংলার সমাজ রূপান্তরের একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন: "সুতরাং বঙ্গ সরকারকে পারস্পরিক সুবিধার্থে জমিদারদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হয়েছিল। সেই সময় থেকে জমিদারদের ব্রিটিশ রাজত্বের অটল সমর্থকরূপে গণ্য করা হয়।"* ব্রিটিশ শাসকরা যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদারদের সাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ার রূপে মনে করত তার সমর্থন পাওয়া যায় দ্বারকানাথের সময়ে উদার শাসক বলে খ্যাত লর্ড বেন্টিঙ্কের উক্তিতেও: "If security was wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though a failure in many other respects and in most important essentials, has this great advantage at least, of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in the continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of the people."[৬৫] এদেশের স্বার্থান্ধ ভূস্বামীদের সম্পর্কে বেন্টিঙ্ক যে আস্থার ভাব তাঁর উক্তিতে ব্যক্ত করেছেন তা যে অবাস্তব ছিল না তার প্রমাণ দ্বারকানাথের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে দ্বারকানাথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিশোরীচাঁদ মিত্র

উল্লেখ করেছেন, "ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বে এদেশের স্বার্থ ন্যস্ত রয়েছে বলে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, একথা—আমরা দেখেছি—তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি বহুবার ঘোষণাও করেছিলেন।"[৬৬] এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে দ্বারকানাথের মতো ব্যক্তিরা ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে এদেশের ভাগ্যকে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করার আশা যে পোষণ করতেন তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লর্ড বেন্টিঙ্কের বিদায়কালীন সংবর্ধনায় প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয়েছিল: "সম্ভাব্য নানা অবস্থাবৈগুণ্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্ট যে-বিচ্ছেদ সে বিচ্ছেদের স্থলে ভাবের এবং স্বার্থের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, বিজেতা এবং বিজিতদের মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্যবোধ মুছে দেওয়া এবং সকলকে মনে-প্রাণে বা আশা-আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজদের সমান করে তোলা।"[৬৭] এদেশীয়রা যখন বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্যবোধ মুছে দেওয়ার আশা ব্যক্ত করেছিলেন তখন বেন্টিঙ্ক প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন: "এই অপ্রীতিকর সত্য আমি কী করে অস্বীকার করি যে, আমার এখানে দীর্ঘ অবস্থানের সময় আমি আমার জাতের মধ্যে বিজেতার কোন মনোভাব দেখিনি, আধিপত্যের দম্ভ দেখিনি, দেখিনি কোন ক্ষমতার অপব্যবহার, কিংবা দুর্বলের উপর সবলের সাবিক অত্যাচার?"[৬৮] ব্রিটিশ শাসক প্রধানের এই বিবৃতিও দ্বারকানাথের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে চৈতন্যের উদ্রেক করতে পারে নি। বরং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশে দ্বারকানাথ যে নিশ্চল ছিলেন তার প্রমাণ দ্বারকানাথের বিলাত ভ্রমণকালে যেমন পাওয়া যায় তেমনি ১৮৪২ সালে বিলাত যাবার প্রাক্কালেও দেখা যায়, তাঁকে প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে দ্বারকানাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে—"অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত।"[৬৯]

ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল

সে বিষয়ে উদাসীন না হলে বিদেশী শাসনলব্ধ সুফলের প্রশংসা উচ্চারিত হতে পারে না। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার যে সাম্রাজ্যিক শাসনকেই দৃঢ় করতে চেয়েছিল আত্মোন্নতির সাফল্যে দ্বারকানাথের মতো জমিদারগণ তা বিস্মৃত হয়েছেন। সে কারণেই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে তিনি একটা মহৎ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বলে মনে করতেন এবং বলতেন যে এর দ্বারা দেশের মুক্তি সহজ হবে।"১০ বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথের কাঙ্ক্ষিত 'মুক্তি' দেশের স্বাধীনতা নয়, এবং রামমোহন-দ্বারকানাথের পরবর্তী কালে উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় মানসে যে 'স্বদেশী' চেতনার উন্মেষ ঘটে দ্বারকানাথের কালে অনুরূপ চেতনা আশা করাটাও বাস্তবসম্মত নয়। তবু, একথা বলতেই হয় যে, সাম্রাজ্যিক শোষণের অধীনে দেশের কোন প্রকার সামাজিক-বৈষয়িক উন্নতিকে 'মুক্তি' কল্পনা করা এবং পরাধীনতার বাস্তব অবস্থার প্রতি চোখ বুজে থেকে শাসকশ্রেণীর প্রতি একতরফা আনুগত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ থাকা রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যক্তিক ও জাতীয় সত্তা অস্বীকারেরই নামান্তর।

৩. Mookerjee, R. K. : op. cit., p. 49. Sinha, N. K. : op. cit., p. 111. Sinha, J. C. : Economic Annals of Bengal, London. 1927, p. 272.

৪. অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম মানস, কলিকাতা,

৫. নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৩২১।

৬. কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর (বঙ্গানুবাদ"), সম্পাদক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সম্বোধি পাবলিকেশানস, কলিকাতা,

ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা,

৭. কিশোরীচাঁদ · ঐ, পৃ ২১০ (প্রসঙ্গকথা)।

৮. ঐ, পৃ ৯।

৯. Kling, Blair B. : Partner in Empire, Calcutta, 1981, p. 37.

১০. ক্ষিতীন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ৫৫।

১১. Kling : op. cit., p. 36.

১২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ৫৫-৫৬।

১৩ Kling : op. cit., p. 37.

১৪. কিশোরীচাঁদ · ঐ, পৃ ১১।

১৫. ঐ, পৃ ১১-১২ ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ৬১।

১৬. Kling : op. cit , p. 33.

১৭. Ibid, p. 38.

১৮. Ibid, p. 33.

১৯. Ibid, pp. 37-38.

২০. Ibid, pp. 38-39.

২১. Ibid. p 39.

২২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৫৯, ৬৩।

২৩. Kling : op. cit., p. 40.

২৪. Ibid, p. 39.

২৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ১০১।

২৬. ঐ, পৃ ১০১।

২৭. ঐ, পৃ ৬২ ; কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১২-১৩ ; Kripalani, Krishna : Dwarkanath Tagore, New Delhi,

২৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৫৭।

২

শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়

ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতের উৎপাদন কাঠামো গড়ে উঠেছিল স্বাদেশিক শিল্পপদ্ধতি ও বৃত্তিগত সামাজিক বিন্যাসকে অবলম্বন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নব নব আবিষ্কার সঞ্জাত শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিলাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে যন্ত্রানুগ আধুনিকতার বিকাশ ঘটে তার সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থা অবশ্যই তুলনীয় হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, তৎকালে রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের সুতী, রেশম ও পশম জাত দ্রব্যের প্রবাদতুল্য সুনাম ও প্রভাবসম্পন্ন বাজারের দৃষ্টান্ত এই সাক্ষ্য বহন করে যে ভারত শিল্পোৎপাদনেই শুধু স্বয়ম্ভর ছিল না, ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীও ছিল উন্নতমানের। শুধু প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশেই নয়, প্রতীচ্যেরও নানা জায়গায় ভারতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি হতো। এমন কি পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি যারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তাদেরও এদেশ জয়ের লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে বণিকবৃত্তি চরিতার্থ করা। ভারতে কোন কিছু রপ্তানি করার কথা তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবত না। ("The conquest of India by the Portuguese, Dutch, and English between 1500 and 1800 had *imports from* India as its object—nobody dreamt of exporting anything there.")[১] সেকালে ভারতীয় সমাজ জীবনেও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। 'মোটা ভাত মোটা কাপড়'-এ তৃপ্ত বিস্তীর্ণ জনসমাজের জীবন-যাত্রা, তার মান যা-ই থাক না কেন, সহজ-সরল-নিশ্চিন্ততায় পূর্ণ ছিল।

এই ছবি যে কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের উক্তিতেও পাওয়া যায়। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবীকরণ সম্পর্কে হাউস অব কমন্স যে-অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল তার নিকট সাক্ষ্য দান কালে ভারতে বিলাতী দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস উত্তর দিয়েছিলেন: "...the poor in India may be said to have no wants. Their wants are confined to their dwellings, to their food, and to a scanty portion of clothing, all of which they can have from the soil that they tread upon."[২] এই স্ব-ভাবে স্বনির্ভর ভারতবর্ষকে শিল্প-বাণিজ্যে ও সম্পদে সর্বস্বান্ত করেছে যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকেরা তারাই নিজেদের বর্বর শোষণের চিত্রকে আড়াল করার জন্য বিশ্বময় রটনা করেছে 'দরিদ্র ভারত'-এর কাহিনী। ব্রিটেনের শিল্প-বিপ্লবজাত উন্নয়নকে সম্ভব করার জন্য বিলাতের শিল্পপতি-সওদাগরদের স্বার্থে ভারতকে কাঁচামালের যোগানদার দেশে পরিণত করে প্রচার করেছে ভারতবর্ষ হল শুধু 'কৃষিকর্মের দেশ'।

ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে শোষণ-নীতি কার্যকর করেছিল তাও জানা যায় পূর্বোক্ত সংসদীয় কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে। সেখানে এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ভারতীয় পণ্য বিলাতের বাজারে বিলাতে উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা ৫০/৬০ ভাগ কম মূল্যে বিক্রি হলেও মুনাফা অর্জনে সক্ষম ছিল। সেজন্য বিলাতের শিল্পকে বাঁচানোর স্বার্থে ভারতীয় পণ্যের ওপর শতকরা ৭০/৮০ ভাগ শুল্ক আরোপ করার এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করা হয়।[৩] ভারতের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতাকে ধ্বংস করার এই চক্রান্তের সমালোচনা করে ভারতবেত্তা এইচ. এইচ. উইলসন বলেছিলেন: যদি এ ধরণের প্রতিবন্ধকতামূলক শুল্ক ও নির্দেশাবলী বলবৎ না করা হতো তাহলে

পেইস্লে (Paisley) ও ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলি শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত এবং বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় সেগুলি সচল করা যেত কিনা সন্দেহ। ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ ঘটিয়েই সেগুলির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারত স্বাধীন দেশ হলে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করত, বিলাতী দ্রব্যের ওপর প্রতিরোধমূলক শুল্ক আরোপ করে সে তার নিজস্ব উৎপাদন শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করত।* তখন পরাধীন ভারতের প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না সত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনা সেখানেই সীমিত থাকে নি—সেই আগ্রাসী শক্তি আরও নির্লজ্জ হতে সাহসী হয়েছিল এই লাঞ্ছিত দেশে তার দোসর পেয়ে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও ইংরেজ সরকার যে এদেশের ধনী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অংশীদার পেয়েছিল তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অবান্তর; তবে আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত তথ্য থেকেও একথার সত্যতা অনুধাবন করা যাবে।

১৮১৩ সালে গৃহীত পূর্বোক্ত বাণিজ্য-নীতি ভারতীয় শিল্পসম্ভারের প্রতি এত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যে ভারত থেকে রঙীন সূতীবস্ত্র ও রেশমজাতীয় দ্রব্যের কোন কিছু নিয়ে কেউ লণ্ডনে প্রবেশ করতে পারত না, এমন কি গামছা নিয়েও না।[৪] অন্যদিকে

* " . had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, even by the power of steam. They were created by the sacrifice of Indian manufacture. Had India been Independent, she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods, and would thus have preserved her own productive industry from annihilation."

(Romesh Dutt : The Economic History of India, Vol. I, 1976. p. 180)

নতুন সনদীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যবসার (private trade) পথ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে ষোল বছরের মধ্যে ব্যক্তিগত বাণিজ্য কোম্পানির বাণিজ্যের তিনগুণ বৃদ্ধি পায়—কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ১৮,৮২,৭১৮ স্টার্লিং পাউণ্ড,সেখানে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৪,৫১,৪৫২ স্টার্লিং পাউণ্ড।[৫] অবাধ বাণিজ্য-নীতির পৃষ্ঠপোষক ইংরেজরা কী জাতীয় মনোবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল অর্থনৈতিক ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়: "What distinguished the British economy was an exceptional sensitivity and responsiveness to pecuniary opportunity. This was a people fascinated by wealth and commerce, collectively and individually."[৬] বলা বাহুল্য, ভারতের সম্পদ প্রাচুর্যের কাহিনীর দ্বারা আকৃষ্ট ইংরেজ সমাজ সে সময়ে ভারতীয় উপনিবেশকে তাদের লালসার নৃত্যভূমিতে পরিণত করেছিল।

ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শোষণ যতদিন পর্যন্ত ভারতের তাঁতশিল্পের ওপর চরম সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে নি ততদিন তাঁত একটা প্রধান জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র ছিল। ১৭৯৯ সালেও দেখা যায়, কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দিতে ইচ্ছুক জনৈক বুলচাঁদ বা নন্দরাম শীলকে প্রশ্ন করা হলে—কি করে খাবে? উত্তরে তারা বলত কাপড় বুনে খাব।[৭] এর দু'দশক পরে ইংরেজ শাসকেরা বাংলার তাঁতশিল্পকে যে-ভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় তার ফলে বুলচাঁদ-নন্দরামের মতো কাপড় বুনে খাওয়ার কথা আর কেউ ভাবতে পারত না। কারণ, ততদিনে ভারতের সূতীবস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করে বিলাত থেকে এদেশে সুতো ও কাপড় আমদানির ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ঢাকাকে ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার বলে গণ্য করা হতো। ইংরেজ সরকার ১৮১৮-তে সেই ঢাকার বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।[৮] এ নির্দেশের পরিণতি ঢাকা শহরের জনজীবনে কী পরিমাণ সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শহরের জনসংখ্যা হ্রাসের তথ্যে। ১৮১৮ সালে

থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে ঢাকার লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে কুড়ি হাজার হয়েছিল।[৯]

১৮২৩ থেকে বিলাতী সুতো ভারতে আমদানি হতে থাকে এবং ১৮২৪-এ এই আমদানির পরিমাণ ছিল যেখানে ১,২১,০০০ ওজন পাউণ্ড ১৮২৮-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪০,০০,০০০ ওজন পাউণ্ড। এ ছাড়া পশমবস্ত্র, তামা, সীসা, লোহা, কাচ প্রভৃতি এবং মৃৎপাত্রাদি পর্যন্ত ভারতে আমদানি হতে থাকে। অন্যদিকে দ্রব্যের মূল্যের ওপর ভারতীয় পণ্যের বিলাতে আমদানি শুল্ক শতকরা চারশ' ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, আর তখন বিলাতী পণ্যের জন্য কলকাতায় আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র।[১০] যদিও দেশী কাপড়ের চেয়ে বিলাতী কাপড় ব্যবহারের দিক থেকে উৎকৃষ্ট ছিল না, তবু প্রথমে এদেশের ধনীরাই বিলাতী কাপড় ব্যবহার করতে শুরু করে এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে যে, যা-কিছু বিলাতী তা-ই উৎকৃষ্ট। ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এদেশের বাজারে অসম* প্রতিযোগিতার ফলে বিলাতী কাপড় দেশী কাপড়ের চেয়ে সস্তায় বিক্রি হতে শুরু করে এবং কলকাতার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী কাপড়ের প্রচলন বৃদ্ধি পায়।[১১] সুতরাং ইংরেজ সরকারের নতুন বাণিজ্য নীতি বিদেশে (যথা—আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন, ডেনমার্ক, স্পেন, পর্তুগাল, মরিসাস্ এবং অন্যান্য এশীয় দেশ)[১২] ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের যে বিরাট বাজার ছিল তাকেই শুধু নষ্ট করে নি স্বদেশের বাজারেও তাঁতশিল্পের অস্তিত্বকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছিল। আর এই সঙ্কট এত তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে ১৮২৮ সালের মধ্যে সারা দেশে বস্ত্রশিল্প

* ১৮৩৫ সালে Lord Ellenborough 'Trevelyan's Report'-এর ওপর মন্তব্য করে বলেছিলেন—ভারতীয় বস্ত্র ভারতের বাজারে বিক্রির জন্য নানা খাতে ১৭½% অন্তঃশুল্ক দিতে হয়।

সংশ্লিষ্ট প্রায় দশ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়।[১৩] এরূপ বেকারের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যেরা বেকারত্বের জ্বালা সইতে না পেরে সন্ন্যাসী-বৈরাগী হয়, এমন কি কুলিগিরি করতেও বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরণের জীবিকা দ্বারা বিরাট ও ব্যাপক বেকারত্বের সমাধান করা সমগ্র তাঁতী সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে কর্মাভাবে অন্নাভাবে অসংখ্য পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[১৪] ব্রিটিশ সরকারের শোষণ-চক্রান্তের পরিণতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিল তার মর্মান্তিক দৃশ্য ব্রিটিশ শাসক-প্রধানের অন্তরকেও সমবেদনায় কাতর করেছিল। এ বিষয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর এক প্রতিবেদনে (১৮৩৪-৩৫) লিখেছিলেন : "The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India".[১৫] ব্রিটেনের শিল্পোন্নতির স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বস্ত্রশিল্পেরই শুধু সর্বনাশ ঘটায় নি, এদেশের নানা প্রকার হস্তশিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দখল করার জন্য শুধু বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয় ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রেও অন্তঃশুল্কের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। যেমন চর্মশিল্পজাত দ্রব্যাদি ও চিনির ওপর এইরূপ শুল্কের পরিমাণ ছিল শতকরা পনর ভাগ। কম করেও দু'শ পঁয়ত্রিশটি পণ্যের ওপর অন্তঃশুল্কের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৬] পূর্বে উল্লেখিত ভারতে আমদানিকৃত পণ্য-তালিকাই প্রমাণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতের দেশীয় শিল্প-কাঠামোকে কী পরিমাণ ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে হয় যে, দেশীয়ভাবে, কৃষি ও উৎপাদন শিল্পের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে সামাজিক সুস্থিতির ভিত রচিত হয়, ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণবৃত্তি ও ধ্বংসলীলা বস্তুত সেই ভিতের উৎসাদন ঘটিয়েছিল। এরূপ দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন যে—

"British steam and science uprooted, over the whole surface of Hindustan, the union between agricultural and manufacturing industry."[১৭] পূর্বোক্ত তথ্যাদি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে যন্ত্রযুগের শিল্প-সম্ভাবনাকে ভারতবর্ষে সঞ্চারিত করায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অনাগ্রহ ইতিহাসে অতি স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক সরকারের সেরূপ উদ্দেশ্য থাকার কথাও নয়। সুতরাং ভারতবর্ষকে শোষণ করাই ছিল ব্রিটিশের কাম্য এবং আলোচিত কালে ভারতের বুকে বসে তারা সেই কামনাকেই চরিতার্থ করেছে মাত্র। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকালে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, ভারতীয় জনজীবনের এরূপ একতরফা ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত ব্রিটিশ সরকার সমসাময়িক কালেই এদেশে উন্নতিকামী-ভাগ্যান্বেষীদের যেমন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, তেমনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী এদেশের ইংরেজ ও ইংরেজী প্রেমীদের মধ্যেও এক প্রকার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

॥ বেনিয়ানবৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ॥

সুতরাং শুধু রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়, ভারত যখন ঔপনিবেশিক চক্রান্তে অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও জর্জরিত তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্মজীবনের বিকাশ। দ্বারকানাথ যে-সকল শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায় উদ্যোগে ব্রতী হয়েছিলেন, দেখা যায়, সে-সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের সাফল্য ও ব্যর্থতা আবর্তিত হয়েছে এক শ্রেণীর ইংরেজের সংশ্লিষ্টতা দ্বারা। এই ইংরেজদের অনেকেই ছিলেন দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ এবং এদেশে অবাধ-বাণিজ্যপ্রেমী সম্প্রদায়ভুক্ত। অবশ্য, দ্বারকানাথের বহুল ও বিচিত্র কর্মজীবনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন অসামান্য কর্মোদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। সাবালকত্ব অর্জন করে তিনি শুধু পৈতৃক জমিদারির কাজে নিজের কর্মজগৎ সীমিত রাখেন নি। নানা অধ্যবসায়ী

কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন—তেজারতি কারবার, কোম্পানির চাকরি, বেনিয়ানবৃত্তি এবং বাণিজ্য প্রভৃতি। তিনি ১৮২০ থেকে জীবনের প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত শতকরা আট থেকে বার টাকা সুদে দু'হাজার টাকা থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত নানা জনকে ঋণ দিয়েছেন। এই ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজ—নীলকর, ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারী।[১৮] আবার ১৮২১ সালেই দেখা যায় দ্বারকানাথ জে. এল. স্যাণ্ডার্স নামে এক সাহেব ব্যবসায়ীর সঙ্গে অংশীদার হয়ে ২৬০ টনের 'রেজলিউশন' নামক জাহাজে মদ, মৌরি ও জায়ফল বুয়েনস্ আয়ার্সে রপ্তানি করেছেন এবং প্রায় সেই সময় থেকেই নিজে নীল, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি কর্মে লিপ্ত হয়েছেন।[১৯]

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত হলে ইউরোপ থেকে এদেশে বেশ সংখ্যক ফটকাবাজ ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে এবং এদের আগমনের ফলে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সে কারণে এবং যেহেতু তখন নীলের ব্যবসা খুব লাভজনক ছিল কলকাতার বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি নীলের কারবারে বেশী করে টাকা বিনিয়োগ করতে শুরু করে। তা ছাড়া, ব্রিটেন থেকে বেশী পরিমাণে সুতো ও সূতীবস্ত্র আমদানি হতে থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যে সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে নীলের রপ্তানিই ছিল আপাত সহায়ক। সে সময়ে ঢাকা থেকে দিল্লী পর্যন্ত দশ লক্ষ একর জমিতে নীল চাষ হতো।[২০] পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যতম রপ্তানি ব্যবসায় ছিল নীল। নীলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আফিম। কলকাতা থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের পরেই ছিল চীনের স্থান এবং চীনদেশে আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে তখন আফিম ছিল প্রধান।[২১] আফিম রপ্তানিক্ষেত্রে রুস্তমজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দ্বারকানাথের দু'তিনটি আফিমবাহী জাহাজ কলকাতা থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত নিয়ত যাতায়াত

করত। ১৮৩১ সালে কলকাতায় নির্মিত ৩৬৩ টনের 'ওয়াটারউইচ' নামে দ্বারকানাথের অংশীদারী-মালিকানাধীন একটি আফিমবাহী জাহাজ ১৮৩৮ সালে ক্যান্টন থেকে কলকাতা মাত্র পঁচিশ দিনে পাড়ি দিয়েছিল। ১৮৩৯-৪২ সালের 'অহিফেন যুদ্ধ' (Opium war)-এর সময় আফিমের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয় এবং দ্বারকানাথের ৩৭১ টনের একটি জাহাজ (Ariel) চীনে পৌঁছলে চীন জাহাজের মাল সমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং জাহাজটি চুক্তি ভাড়ায় (chartered) সরকারীভাবে ব্যবহারের জন্য অধিকার করে। তা ছাড়া আরও একটি আফিমবাহী জাহাজ (Mavis) বজ্রপাতে বিনষ্ট হয়।[২২]

বেনিয়ান হিসেবেও দ্বারকানাথ খ্যাত ছিলেন. তৎকালে এদেশীয় বেনিয়ানরা বিদেশী বা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের টাকার যোগানদার বা দালাল রূপে কাজ করত। অবশ্য দ্বারকানাথ নিজেকে 'মার্চেন্ট' বলে গণ্য করাতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন।[২৩] কলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতি দ্বারকানাথের যে শ্রদ্ধা ছিল তাকে এই আগ্রহের উৎস বলে চিহ্নিত করা যায়। কেননা একটি ভাষণে দ্বারকানাথ বলেছিলেন: "আমরা আমাদের মফঃস্বলবাসীদের মত পিছিয়ে নেই, ...তাদের তুলনায় আমাদের এ অগ্রসরতার জন্য আমরা কাদের কাছে ঋণী? আজকের ইংরেজদের কাছে। কুড়ি বছর আগে কোম্পানীর কাছে আমরা ভৃত্যের ব্যবহার পেতাম। কলকাতার ব্যবসায়ী ছাড়া আর কে আমাদের এ অবস্থা থেকে উন্নীত করেছে?... কলকাতার অধিবাসীরা আজ যে তাদের মফঃস্বলবাসী ভাইদের থেকে প্রাধান্য লাভ করেছে তার জন্যে তারা ঋণী ব্যবসায়ী, দালাল এবং অপরাপর স্বাধীন ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের কাছে।"[২৪]

প্রথমদিকে দ্বারকানাথ যে-সব বাণিজ্যসংস্থার সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বেঙ্গল স্টীম ফাণ্ড' এবং 'ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি'। কলকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ১৮২৩ সাল থেকেই উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু ঐ পথ অবাস্তব প্রমাণিত হলে সুয়েজের ইস্থমাস্ স্থলপথকেই মধ্যবর্তী পথ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[২৫] কৃষ্ণ কৃপালনি অবশ্য বলেছেন, এই মধ্যবর্তী স্থলপথ অতিক্রম করে বিলাত যাওয়ার পথ নির্বাচনের স্বপ্ন বিশ দশকের গোড়ায় দ্বারকানাথই দেখেছিলেন এবং এই পথ ধরেই তিনি ১৮৪২ সালে বিলাতে পৌঁছেছিলেন।[২৬] ঐ পথে দ্বারকানাথ বিলাত গমন করেছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ পথ নির্বাচন সম্পর্কে বিশ দশকের গোড়ায় দ্বারকানাথের স্বপ্ন দেখার যে-কথা কৃপালনি বলেছেন সে-বিষয়ে তিনি কোন তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। পক্ষান্তরে দেখা যায়, ১৮৩৩ সালে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে জাহাজ-পথ নির্ধারণের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং বেঙ্গল স্টীম ফাণ্ড নামে এক অংশীদারী সংস্থার উদ্ভব ঘটে।* এই সংস্থা স্থাপনের প্রয়াসে অগ্রবর্তী ছিলেন দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ এইচ. এম. পার্কার (সংস্থার সভাপতি); দ্বারকানাথ ও অপরাপর ইংরেজ (যথা—টি. ই. এম. টার্টন, উইলিয়ম প্রিন্সেপ এবং সংস্থার সম্পাদক সি. বি. গ্রীন্‌ল) বেঙ্গল স্টীম ফাণ্ডের পরিচালক (directors) ছিলেন। বিলাতে তদবির-তদারক করে জাহাজ-পথের অধিকার লাভ করার জন্য ১,৭৮,৬৩১ টাকার তহবিল সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর ধরে প্রয়াস চালিয়েও এ বিষয়ে কোন সুরাহা হয় না। শেষ পর্যন্ত এই কোম্পানির কলকাতার ও বিলাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুযোগ বুঝে Peninsular

---

* উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ১৮৩৩ সালের জুন মাসে 'নিউ বেঙ্গল স্টীম ফাণ্ড' নামে সংস্থা গঠনের উদ্যোগ হয়েছিল এবং কিছু ইউরোপীয় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর সহ বহু এদেশীয় ব্যক্তি সেই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত ফাণ্ডে চার টাকা থেকে এক হাজার টাকার চাঁদার তালিকা দেখে মনে হয় সে উদ্যোগ ছিল অভিলাষ মাত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ ৩৪৩-৪৪)

Steam Navigation Company-র (যারা তখন স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ চালাত) সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করে এবং একটি সুসংগত পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত কোম্পানি ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ-পথের সরকারী ডাক বহনের অধিকার লাভ করে। এর ফলে ঐ কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে Peninsular and Oriental রাখা হয়। এই P. & O. কোম্পানি সীমাবদ্ধ দায়ে রাজকীয় সনদ প্রাপ্ত হয়।[২৭] ক্ষিতীন্দ্রনাথ থেকে জানা যায়, দ্বারকানাথ পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানিরও অংশীদার হয়েছিলেন।[২৮]

পূর্বোক্ত সংস্থা 'ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২২ সালে এবং অনুমান করা হয় জীবন বীমাব ক্ষেত্রে এটাই প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল ঋণ-গ্রস্ত অংশীদারদের জীবন বীমা করা ও সওদাগরি সংস্থাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া। প্রথমে এই কোম্পানির আশা ছিল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বড় বড় সওদাগরি সংস্থাগুলি অংশীদার হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তবে এই কোম্পানির অংশীদার-মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ এবং তিনটি সওদাগরি সংস্থা—ফার্গুসন কোং, ক্রুটেণ্ডন কোং এবং ম্যাকিন্টশ কোং। এই জীবন বীমা সংস্থার কার্য পরিচালনা করত ম্যাকিন্টশ কোম্পানি। ম্যাকিন্টশ কোম্পানি সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা দু'টির পতন ঘটায় ১৮৩৫ সালে দ্বারকানাথ দেনা-পাওনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নতুনভাবে নতুন অংশীদারদের নিয়ে 'নিউ ওরিয়েন্টাল লাইফ এ্যাস্যুরেন্স সোসাইটি' গঠন করেন।[২৯] (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার অন্যতম এজেন্সী হাউস বা সওদাগরি সংস্থা ম্যাকিন্টশ কোম্পানির সঙ্গে দ্বারকানাথের সংযোগ ছিল টাকার যোগানদার বা বেনিয়ান হিসেবে।[৩০]) রামমোহন রায় এই কোম্পানির মারফত তাঁর ব্যবসা চালাতেন এবং কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এ. ম্যাকিন্টশ ছিলেন রামমোহনের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। যদিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ঠাকুর পরিবার গোপীমোহন ঠাকুরের সময় থেকেই ম্যাকিন্টশ কোম্পানির

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল,[৩০] তবুও, হয়ত, রামমোহনের সংশ্লিষ্টতা হেতুই দ্বারকানাথ ম্যাকিণ্টশ কোম্পানির সঙ্গে পরিচিত হন, এবং পরে এই কোম্পানির সংস্থা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের* অংশীদারও হন। ১৮২৮-এ ম্যাকিণ্টশ কোম্পানি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক' অবিভাজ্য সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। আর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক তখন বস্তুত ম্যাকিণ্টশের কোষাগারে পর্যবসিত এবং ঐ সময়ে ব্যাঙ্কের মালিকানার তালিকায় দ্বারকানাথ ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই ম্যাকিণ্টশের সদস্য।[৩১] ১৮৩৩-এ যখন ম্যাকিণ্টশ কোম্পানি ও সেই সঙ্গে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন ঘটে তখন দ্বারকানাথ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন—"শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে কমরস্থল বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং ঐ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন এবং ঐ বাঙ্কের যত পাওনা আছে তাহা তিনি লইবেন। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জানুআরি।"[৩২]

॥ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ॥

অবশ্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন ঘটার পূর্বেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

---

* কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক—১ মে, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাকিণ্টশ অ্যাণ্ড কোং-এর অংশীদার গর্ডন, কল্ভার, জোসেফ ব্যারেটো, জন মেলভিল প্রভৃতি এবং গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যকুমার ঠাকুর এই ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তা-অংশীদার ছিলেন। সূর্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (স সে. ক., প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৮) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্লেয়ার ক্লিঙ (p. 42) এবং কৃষ্ণ কৃপালনি (p. 75) উভয়েই ব্যাঙ্কের সঙ্গে গোপীমোহন ঠাকুরের সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই প্রসঙ্গে গোপীমোহন ঠাকুরের নামোল্লেখ করেছেন (পৃ ১৩৮)। বস্তুত গোপীমোহন ঠাকুর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় জীবিত ছিলেন না, ১৮১৮-তে তাঁর মৃত্যু হয়। (স. সে. ক., ১ খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৯২)

স্থাপিত হয় (১৮২৯)। দ্বারকানাথের উদ্যমশীলতার অন্যতম দৃষ্টান্ত রূপে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চিহ্নিত। সেজন্য, সংক্ষেপে হলেও, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যখন গঠিত হয় তখন একমাত্র সবল ব্যাঙ্ক ছিল ১৮০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল'। 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' আধা-সরকারী ব্যাঙ্ক হওয়ায় এই ব্যাঙ্কের নিয়ম-কানুন ছিল কঠোর এবং কলকাতার ব্যবসায়ী মহল এই ব্যাঙ্ক থেকে কোন সহায়তাই প্রায় লাভ করত না। সে সময়ে আরও যে দু'টি ব্যাঙ্ক ছিল (১৭৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত আলেকজাণ্ডার কোং সংশ্লিষ্ট 'হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক' ও ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জন পামার কোং সংশ্লিষ্ট 'ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক') তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সে কারণে বেসরকারী ক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যাঙ্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[৩৩] কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নতুন ব্যাঙ্ক গঠনে প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে যে ম্যাকিন্টশ কোম্পানি তার নিজস্ব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক তখনও সজীব ছিল। যা হোক, নতুন ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য ১৬ মে ১৮২৯ তারিখাঙ্কিত ম্যাকিন্টশ অ্যাণ্ড কোম্পানির একটি বিজ্ঞপ্তি ১৮ মে ১৮২৯-এর সরকারী গেজেটে মুদ্রিত হয়। নতুন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বিবরণ সহ বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতার বাণিজ্য কক্ষে (Exchange Room) ২৫ মে ১৮২৯ তারিখে পূর্বাহ্ণ দশ ঘটিকায় নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৩৪] ২১ মে ১৮২৯ তারিখে 'New Public Bank' শিরোনামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নতুন ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়। সাধারণের আস্থা লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট যে-নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম হল—মুনাফার প্রলোভন থাকলেও প্রতিষ্ঠানের দৃঢ় অবস্থা রক্ষা করার জন্য কোন সরকারকেই ঋণ বা আগাম দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়—কাজকর্মে গোপনীয়তা থাকবে না, শুধু লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রেই নয় মূলধন ও জমাকৃত অর্থ ছাড়াও লেনদেনের সঠিক তথ্য অল্পদিনের ব্যবধানে

প্রকাশিত হবে। তৃতীয় — অংশীদারদের শেয়ার- সংখ্যা সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয় বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৫] এই সকল উদ্দেশ্য বা নীতি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা পূর্ববর্তী বছরেই স্থির করেছিল, উক্ত তারিখে তা প্রকাশ করে বলা হয় যে, সংস্থাটি মূলধন হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে একটি বিস্তৃত প্ররিধির যৌথ সংস্থা রূপে পরিচালিত হবে। ("Adopting the above principles the Proprietors of Commercial Bank proposed last year to throw their establishment open to the public, to be conducted on the footing of an extensive Joint Stock Company, with a capital of Fifty Laks of Rupees.")[৩৫] ১ জুন ১৮২৯ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২৫ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় * উক্ত সভায় ব্যাঙ্কের সভাপতি রূপে ঘোষিত হন জন স্মিথ এবং সম্পাদক রূপে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন ডব্লিউ. সি. হারি। জি. জে. গর্ডন উত্থাপিত এবং জি. এ. প্রিন্সেপ সমর্থিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়েছিল: "That it is expedient to establish Joint-Stock Banking Company upon a broad and public basis, to be carried on under a separate and distinct establishment of its own."[৩৬] অপর একটি প্রস্তাবে গর্ডন এই ব্যাঙ্কের নাম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভায় ঐ নাম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হলে ব্যাঙ্কের নাম পরে স্থির করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভায় নতুন ব্যাঙ্কের অংশীদার হতে ইচ্ছুক যে শতাধিক ব্যক্তি নাম লিপিবদ্ধ করেন তাঁদের মধ্য থেকে চব্বিশ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছ' জন ভারতীয়ের নাম ছিল: হরিমোহন ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, রাজচন্দ্র রায় [দাস ?],** রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়ভন হামিরমল

* টীকা 'গ' দ্রষ্টব্য।

** সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৯-এ "[দাস ? [, এভাবে মুদ্রিত রয়েছে। যেহেতু ডিরেক্টর বোর্ড-এ রাজচন্দ্র দাস-এর নামোল্লেখ রয়েছে, মনে হয়, 'রায়'-এর স্থলে 'দাস'-ই হবে।

এবং দয়াচাঁদ তিলকচাঁদ। এই কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, আগামী ১৫ জুনের মধ্যে সদস্যদের এক সাধারণ সভায় বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।[৩৭]

পরবর্তী কোন এক সময়ে উক্ত নতুন ব্যাঙ্কের নাম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হয়ে থাকবে।[৩৮] তৎকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায়, শুরুতে পনর জন ডিরেক্টর নিয়ে ব্যাঙ্কের বোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং সেই বোর্ডে তিনজন বাঙালী ছিলেন: রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন ঠাকুর ও রাজচন্দ্র দাস। পরে ৩ জুন ১৮২৯-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় বোর্ডের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে যখন কুড়ি জন করা হয় তখন বর্দ্ধিত পাঁচ জনের মধ্যে দু' জন বাঙালী সদস্য নেওয়া হয়েছিল।[৩৯] ব্যাঙ্কের ট্রাস্টি হিসেবে তিন জন ছিলেন: 'কম্পটন সাহেব', 'ডিকিন সাহেব' ও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়*।[৪০] প্রথমে সেক্রেটারি হিসেবে যদিও ডব্লিউ. সি. হারি সাহেবের নাম ছিল কিন্তু ঐ পদ গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত[৪০] হওয়ায় সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন উইলিয়ম কার।[৪১] ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ পদে দু' জন প্রার্থী ছিলেন—রমানাথ ঠাকুর ও আশুতোষ সরকার। এই পদে নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে সত্তরটি ভোট বেশী পেয়ে রমানাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই ভোট গ্রহণ সম্পর্কে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে, "এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ

---

* ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯-এর এক সংবাদে উল্লেখ পাওয়া যায়, রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ট্রাস্টি পদ থেকে ইস্তফা দেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১৪৯)। ব্লেয়ার ক্লিঙ (Partner in Empire, p. 43) বলেছেন, আশুতোষ দে তিনজনের মধ্যে একজন ট্রাস্টি ছিলেন। সুতরাং, নৃসিংহচন্দ্র রায় পদত্যাগ করার পর আশুতোষ দে তাঁর স্থলে মনোনীত হয়ে থাকবেন বলে অনুমান হয়।

করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিল না অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল॥"[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর "বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের অফিস থেকে ছাড়িয়ে এনে ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। পরে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে রমানাথের সহকারীর পদে বৃত করেন (১৮৩৪)।"[৪৩] উল্লেখ্য, অধিক সংখ্যক ভোটের ওপর দ্বারকানাথের নিজস্ব যে প্রভাব ছিল তার ফলেই কোষাধ্যক্ষ পদে রমানাথ ঠাকুর নির্বাচিত হন।* ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ইতিহাসে সেক্রেটারি পদে অনেকবারই পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ পদে রমানাথ ঠাকুর সর্বদা এবং শেষ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। লক্ষণীয়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে কোন কর্মকাণ্ডেই দ্বারকানাথের উপস্থিতির উল্লেখ নেই, অথচ এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় দ্বারকানাথ যে উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন সে বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে "এই ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করেন মেসার্স জে. জি. গর্ডন**, জে. কল্ডার, জন পামার, কর্ণেল জেমস ইয়ং এবং দ্বারকানাথ।"[৪৪] ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন: "তিনি (দ্বারকানাথ) অবসর বুঝিয়া পামার কোম্পানীর এবং কমার্স্যাল ব্যাঙ্কের অপরাপর সত্ত্বাধিকারীর নিকট যৌথ কারবারের প্রণালীতে এক ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব করিলেন।...দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার (ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের) প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক হইলেও আরও কয়েকব্যক্তি প্রথমাবধি

---

* "Although ten votes was the maximum number any single shareholder could exercise, Dwarkanath had a large constituency among the shareholders. Some were his dependents, some his debtors, and others his friends and relatives, and some shares had been bought by Dwarkanath in the name of others." (Blair Kling : Partner in Empire, 1981, p. 43)

** জি. জে. গর্ডন হবে, কারণ পুরো নাম জর্জ জেমস্ গর্ডন।

তাঁহার সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক যোগদান করিয়াছিলেন— (১) জর্জ্জ জেম্‌স্‌ গর্ডন, (২) জন পামার এবং (৩) কর্ণেল জেমস ইয়ঙ্গ।"[৪৫] যদিও বলা হয়ে থাকে যে, 'সরকারী চাকুরে বলে দ্বারকানাথ প্রথম প্রথম প্রকাশ্যভাবে এই ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন নি,'[৪৬] কিন্তু তা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ চাকরিতে বহাল থাকা কালেই দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, ১৮:৩ সালে দ্বারকানাথ পরিচালক সভার সদস্য হয়েছিলেন।[৪৭] কিন্তু সংবাদপত্রে দেখা যায়, দ্বারকানাথ ১৮৩১ সালেই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।* আইনত সরকারী চাকরি যে দ্বারকানাথের ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অন্তরায় ছিল না তার আরও প্রমাণ যে, তিনি চাকরিতে থাকা অবস্থায়ই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কেরও অংশীদার হয়েছিলেন। সুতরাং সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে উল্লিখিত-ভাবে অংশীদার হওয়ায় বা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকায় দ্বারকানাথের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তবে, দ্বারকানাথ প্রথমাবস্থায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুক্ত ছিলেন না। কেন ছিলেন না, সে বিষয়ে তথ্যহীন গবেষণা অবান্তর।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হল, (১) কোন অবস্থাতেই সরকারকে ঋণ দেওয়া চলবে না; (২) প্রকাশ্যে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলবে এবং ব্যাঙ্কের মূলধনের অবস্থা

* ২৩ জুলাই ১৮৩১-এ প্রকাশিত সংবাদ: "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দৃষ্ট হইল যে শ্রীযুত ক্রস ও শ্রীযুত কলন্‌ ও শ্রীযুত হরি ও শ্রীযুত সটন্‌ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ পদ ধারণের মিয়াদ গত হইয়াছে অতএব তাঁহারদের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর ব্রোণ ও শ্রীযুত আর এচ্‌ ব্রোণ ও শ্রীযুত সাও ও শ্রীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ ৩৩৭)

ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে ; (৩) প্রতিটি অংশীদারের শেয়ারের সংখ্যা সীমিত থাকবে। এই যৌথ ব্যাঙ্কের মূলধনের লক্ষ্য মাত্রা হবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।[৪৮] প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২,৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল এবং ২,০০০ শেয়ারের মাধ্যমে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব ছিল।[৪৯] ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্যারম্ভের তারিখ ও আদায়ীকৃত মূলধন সম্পর্কে তথ্যবিভ্রাট* লক্ষিত হলেও একথা বলা যায় যে, ১৮২৯-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বার থেকে ষোল লক্ষ টাকার মূলধন সংগৃহীত হলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা শুরু করে।[৫০] ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রার্থনা করেও সরকারের কাছ থেকে 'চার্টার'** লাভ করতে পারে নি। চার্টার না পাওয়ার কারণ তখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন আইন রচিত হয় নি, ফলে ব্যাঙ্কের যদি পতন ঘটে তবে আমানতকারী ও পাওনাদারদের পক্ষে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আইনের দিক থেকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যৌথ (Joint-Stock) সংস্থা ছিল না, অংশীদারী (Partnership) সংস্থা ছিল।[৫১] তবু বেসরকারী ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের আবির্ভাব, উদ্দেশ্য ও সামর্থ্যের বিচারে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনায় প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যের অপহ্নব ও সামর্থ্যের অপব্যবহার ঘটানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তসমূহের অবতারণায় ব্যাঙ্কের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য।

কার্যারম্ভের শুরুতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক জাঁদরেল ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে থাকে এবং যে জন পামার অ্যাণ্ড কোম্পানির পতন আসন্ন তাকেও ছ' লক্ষ টাকা (অর্থাৎ মূলধনের প্রায় অর্ধেক) ঋণ দেওয়া হয়।

* টীকা 'ঘ' দ্রষ্টব্য

** টীকা 'ঙ' দ্রষ্টব্য

১৮৩০ সালে এই পামার কোম্পানির পতন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্কের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।[৫২] ১৮৩০-৩৩ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অংশীদারদের কোন লভ্যাংশ দিতে পারে নি, সে সময় ব্যাঙ্কের শেয়ারমূল্য পড়ে গিয়ে অর্ধেকে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের অগ্রগতি ঘটতে থাকে, শেয়ারের দাম চড়ে সমান বা বেশী দামেও বিক্রি হয় এবং ব্যাঙ্ক এই সময়ের মধ্যে শতকরা ছয় থেকে আট ভাগ লভ্যাংশ বিতরণ করেছিল।[৫৩] ক্রমান্বয়ে ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বৃদ্ধির মাত্রা ১৮৩৬-এ একুশ লক্ষ টাকা থেকে ১৮৩৯-এ এক কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উত্তর ভারত, ইউরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিল।[৫৪] বিদেশস্থ অংশীদারেরা শতকরা তিরিশ ভাগ হলেও শতকরা আটতিরিশ ভাগ মূলধনের অধিকারী ছিল এবং শতকরা চল্লিশ ভাগ ভোট এদের অধিকারে ছিল।[৫৫] সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ব্যাঙ্কের এই অগ্রগতির পশ্চাতে ব্যাঙ্কের পরিচালনায় দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের যে কিছুটা অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কারণ আলোচ্য সময়ে কলকাতার কয়েকটি সওদাগরি সংস্থার পতন ঘটায় দ্বারকানাথের সাথী ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে এই সময়ে দ্বারকানাথের জমিদারি থেকে আয় ছিল বছরে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার মতো।[৫৬] এতদ্ভিন্ন দ্বারকানাথের ঋণ সংগ্রহের অসামান্য ক্ষমতা ছিল এবং ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে যে দ্বারকানাথ ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারাই চালিত হতেন তারও নজির রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বারকানাথ-সুহৃদ জন পামার, যিনি দ্বারকানাথকে 'Dwarky' বলে সম্বোধন করতেন, এক সময়ে জনৈক সাহায্যপ্রার্থীকে এক চিঠিতে দ্বারকানাথ সম্পর্কে লেখেন: "I fancy he borrows to lend and to carry on his own concerns."[৫৭] ১৮৩৩-এ ম্যাকিন্টশ কোম্পানির যখন পতন ঘটে তখন এই কোম্পানির মণ্ডলঘাটের সম্পত্তির কর দেড় লক্ষ টাকা বাকি পড়েছিল। দ্বারকানাথ ঋণ করে ঐ কর পরিশোধ করেন।[৫৮] এ

ভাবেই হয়ত দ্বারকানাথ মণ্ডলঘাটের সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ঋণ দেবার ক্ষেত্রে যে সকল পন্থা অবলম্বন করেছিল তা ব্যাঙ্কের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী ছিল। 'ক্যাস-ক্রেডিট' বা নগদ-ধার প্রথা প্রবর্তন করে ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত জামিনে বা নামমাত্র জামিন রেখে নগদ-ধার দিত এবং এই নগদ-ধার চার মাসের মেয়াদে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষ হলেও বস্তুত অপরিশোধিত ঋণের কাগজ তিন মাস অন্তর বদল করে খাতাপত্রে হিসাব রক্ষা করা হতো। এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখছেন, "যখন একরারনামায় ঋণ পরিশোধের সময় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তখন তাহার বিপরীতে কার্য্য করাকে আমরা জুয়াচুরী ব্যতীত অন্য কোন নামে নির্দ্দেশ করিতে পারি না।"[৫৯] ক্ষিতীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ নগদ-ধার প্রথার প্রতি দ্বারকানাথের প্রথমে আপত্তি ছিল, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন ইংরেজরা এর সুযোগ গ্রহণে তৎপর তখন তিনিও "সাধ্যমত কার-ঠাকুর কোম্পানীর জন্য দুই প্রকারেই (দাদন ও নগদ) টাকা ধার লইলেন এবং আরও অনেক বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্ক হইতে ধার দেওয়াইলেন।"[৬০] প্রসঙ্গত ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সুদূর কালের ব্যবধানে আমাদিগের বোধ হয় এরূপ ধার না লইলে ভালই করিতেন—তাহাতে তাঁহার (দ্বারকানাথের) কারবার বেশী বিস্তৃত না হউক, বেশী স্থায়িত্বলাভ করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[৬১] শুধু নগদ-ধারের ক্ষেত্রেই যে ব্যাঙ্কের টাকা যদৃচ্ছভাবে তছনছ হয়েছে তা নয়, গুদামজাত মালের বিনিময়ে প্রদত্ত ঋণও রীতিবিরুদ্ধ প্রথায় দেওয়া হতো। কারণ গুদামের বন্ধকী মাল বিক্রি করবার অধিকার ঋণ গ্রহীতারই থাকত, ফলে ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত জামিনের যে কোন মূল্যই ছিল না তা বলাই বাহুল্য।[৬২] ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক হুণ্ডির (Bill of Exchange) কারবার করত। এই কারবারে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা থাকলেও দেখা যায় ব্যাঙ্ক কারবারের বদলে এই প্রথায় টাকা ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিকেই আশ্রয় করেছিল বেশী। কারণ, হুণ্ডি কেটে ব্যাঙ্ক থেকে যারা টাকা

নিত তারা টাকা পরিশোধের সময় এলে আবার অনুরূপ একটা হুণ্ডি কেটে ঋণ গ্রহণ করে কাগজের মাধ্যমেই পূর্ব ঋণের টাকা পরিশোধ করত। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা বের হয়ে যেত তা আর ফেরত না আসায় ব্যাঙ্কের নগদ টাকার অভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের মতে ব্যাঙ্ক 'কাগজের ভারে ডুবিয়া গেল'।[৬৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, দ্বারকানাথ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিল-ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার সমর্থক ছিলেন।*

সর্বোপরি নীলের ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কের টাকা বিনিয়োগ এবং অসৎ নীলকুঠিওয়ালাদের ব্যাঙ্ক থেকে ক্রমাগত সাহায্য করার যে দৃষ্টান্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য-কলাপে পাওয়া যায় তাকে এক প্রকার লুণ্ঠনবৃত্তি বলা চলে। প্রথমত নীলের ব্যাপারে লগ্নীকৃত টাকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করত নীলের উৎপাদনের ওপর, যা ছিল অনিশ্চিত। এ বিষয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ইংল্যাণ্ডে তাঁর এক বন্ধুকে এক সময়ে লিখেছিলেন: "If we have a bad indigo crop the whole of Calcutta will suspend."[৬৪] দ্বিতীয়ত, প্রদত্ত ঋণ শুধু নীল উৎপাদনেব ঝুঁকিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অভিসন্ধিমূলকভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তিও যে ঋণ গ্রহণকারী কুঠিওয়ালাদের মধ্যে ছিল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৮৪৩ সালে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া নীলকুঠির মালিকদের ঋণ দেওয়া বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইহা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। ইহার ভাবার্থ এই যে কুঠিওয়ালাগণ সাধারণের অর্থে ব্যাঙ্কের ছায়াতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন।"[৬৫] এভাবে ঋণ দেওয়ার ফলে, দেখা যায়, ১৮৪৭ সালে ছয়টি** বাণিজ্যকুঠির কাছে তিয়াত্তর লক্ষ টাকা

---

* অংশীদারদের সভায় বিল-ব্যবসা সংক্রান্ত প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হয়েছিল তখন "the Tagore steamroller carried it 462 to 63." (Blair kling: Partner in Empire, 1981, p. 204) অর্থাৎ অংশীদারদের মধ্যে দ্বারকানাথের প্রভাবের দ্বারাই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছিল।

** ছয়টি বাণিজ্যকুঠি সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়: "Indeed, after

আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল বা তারা 'উদরস্থ করিয়াছিল'।[৬৬] ব্যাঙ্কের এ ধরনের কার্যাবলী সম্পর্কে দ্বারকানাথ যে অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৪৪-এর ১২ অক্টোবর তারিখে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিকে লেখা দ্বারকানাথের একটি চিঠি* থেকে। চিঠির মর্মার্থে দেখা যায়, দ্বারকানাথ কুঠিওয়ালাদেরকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে বলেন নি, বরং নানা যুক্তি দ্বারা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। ক্ষতি যা হবার হয়েছে, কত কম লোকসানে এর মীমাংসা হয় তিনি তাই দেখতে বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ১৮৪৩-এ নীলের কারবারে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে একত্রিশ লক্ষ টাকা বাকি পড়েছিল তার মধ্যে ছিল পরবর্তী বছরের জন্য অগ্রিম দেওয়া পঁচিশ লক্ষ টাকা।[৬৭] আর এইভাবে বাকি পড়া টাকার অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েই খুব সম্ভবত ১৮৪৭-এ পূর্বোক্ত তিয়াত্তর লক্ষ টাকায় পৌঁছেছিল। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কার-ঠাকুর কোম্পানিকেও নীলের কারবারে আঠার লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল।[৬৮]) (সুতরাং দেখা যায়, কার্যত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অসৎ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কুঠিওয়ালাদের পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।) নীলের কারবারে বেশী মাত্রায় ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নী করার ক্ষেত্রে সমালোচনা এড়াবার জন্যই হোক বা ঋণের টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই হোক এ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের হিসাবে যে কারচুপি করা হয়েছিল তারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৮৪৬-৪৭ সালের এক হিসাবে দেখা যায় বস্তুত নীলের জন্য প্রদত্ত ঋণসমূহকে অন্যান্য খাতে দেখান হয়েছে, যথা—প্রাইভেট বিল, পোস্ট বিল, সরকারী

1834, the directors were invariably selected from members of six agency houses—Carr, Tagore and Company ; Cockrell and Company ; Gilmore and Company ; Hamilton and Company ; Fergusson Brothers ; and William Storm."

কাগজ, জয়েন্ট স্টক শেয়ার ও ব্যক্তিগত জামিন ইত্যাদি খাতে। এ সম্পর্কে ব্লেয়ার ক্লিঙ মন্তব্য করেছেন যে, "Almost every rupee loaned by the bank eventually found its way to an indigo plantation."[৬৯] ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক যে প্রতারণামূলকভাবে হিসাব রক্ষা করায় অভ্যস্ত ছিল সে বিষয়ে সূত্র নির্দেশ করে ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মন্তব্য করেছেন: "The Union Bank published accounts but they were fabricated to deceive."[৭০]

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্যাবলীতে প্রতারণা ও তহবিল তছরুপ সংক্রান্ত জালিয়াতির ঘটনারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর এইসব প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনা ব্যাঙ্কের সঙ্গে দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার সময়েই ঘটেছিল। যেমন, ১৮৩৮ সালে ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষক এ. এইচ. সিম-কে হঠকারিতার জন্য বিতাড়িত করা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ স্বীয় প্রভাবের দ্বারা সিম সাহেবকে ব্যাঙ্কের চাকরিতে পুনর্বহাল করেন এবং ১৮৩৯ সালেই আবার এই সিম সাহেব ১,২০,৬০০ টাকা হিসাবে কারচুপি করে ঐ টাকা তছরুপ করেছে বলে অভিযুক্ত হয়। ঘটনাটি দ্বারকানাথকে জানান হলে তিনি ব্যাঙ্কের তিনজন মুরুব্বি—উইলিয়ম কার, লঙ্‌ভিল ক্লার্ক ও চেয়ারম্যান জেমস্ কুলেনের সঙ্গে আলোচনা করে জানান যে প্রতারণার বিষয়টি গোপন রাখা হলে তিনি নিজে ঐ অর্থ ব্যাঙ্ককে ক্ষতিপূরণ বাবত দেবেন। কিন্তু দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি গোপন না থাকা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ ক্ষতিপূরণ বাবত উক্ত টাকা ব্যাঙ্ককে দিয়েছিলেন।[৭১] ব্যাঙ্কের সুনাম রক্ষার জন্য দ্বারকানাথ ঐ টাকা দিয়েছিলেন, এ যুক্তি বাহ্যত মেনে নিয়েও একথা বলা যায় যে, দুর্নীতিগ্রস্ত জেনেও সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষককে দ্বারকানাথই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। শুধু সিম সাহেবের মতো অধীনস্থ কর্মচারীরাই দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল না, পরিচালকবৃন্দের মধ্যেও ব্যাঙ্কের টাকা তছনছ করার প্রবৃত্তি ছিল প্রকট। ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত বিষয়ে সাক্ষ্যদানকালে

পরিচালকদের অন্যতম ডব্লিউ. পি. গ্রান্ট বলেছিলেন : "Credit was given on the names, not on the shares. Radhamadhab Banerjee* (who was a director at the time) was one of the original dissidents."[৭২] ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ যে ভাবা হতো না উক্ত সাক্ষ্য তার প্রমাণ। দ্বারকানাথের ইংরেজ বন্ধুদের অন্যতম কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের মাস্টার অব্ ইকুইটি ও ককরেল কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডব্লিউ. পি. গ্রান্ট ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ফিনান্স কমিটিব চেয়ারম্যান। এই কমিটির অপর দুই সদস্য ছিলেন ককরেল কোম্পানির জন বেক্উইথ ও কল্ভিল গিলমোর কোম্পানির ডব্লিউ. এফ. গিলমোর।[৭৩] ব্যাঙ্কের অপরাপর পরিচালকবৃন্দও ছিলেন কলকাতার এজেন্সী হাউসগুলির সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যাঙ্ক থেকে অন্যায়-ভাবে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পরের সহায়ক ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও যে একইভাবে ঋণ নিতেন সে কথাও উল্লেখিত হয়েছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন** এবং ১৮৪৮-এ প্রায় একই সঙ্গে ককরেল কোম্পানি, কলভিল গিলমোর কোং, লায়ল ম্যাথেসন কোং, কার-টেগোর কোং, রুস্তমজী-টার্নার কোং এবং ওসওয়াল্ড-শীল কোং সমূহের পতনের ঘটনা ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের অশুভ যোগাযোগের পরিণতি বলে আংশিকভাবে ধরা যায়।***[৭৪]

বলা বাহুল্য, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তবু পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে এ সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, ব্যাঙ্কের কার্য-পরিচালনায় অসৎ পন্থা অবলম্বন-

* রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৪-৩৯ সময়কালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিও ছিলেন।

কারীদের প্রতি দ্বারকানাথের ভূমিকা ছিল সহযাত্রীর। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর আলোচনায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাঙ্কের দুই ইংরেজ সেক্রেটারি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "ম্যাকিন্টস কোম্পানীর ভূতপূর্ব অংশীদারদ্বয় গর্ডন এবং ষ্টুয়ার্ট যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন জানা কথা যে ব্যাঙ্কে জুয়াচুরীর স্রোত চলিবে এবং পরিণামে তাহারই ফলে ব্যাঙ্কের মহাপতন ঘটিবে।"[৭৫] ব্যাঙ্ক 'মহাপতন'-এর হাত থেকে রক্ষা পায় নি সত্য, কিন্তু একথাও সত্য যে, সেক্রেটারি জি. জে. গর্ডন বা জে. সি. স্টুয়ার্ট কেউই দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। ১৮৪০ সালে যখন জেমস্ ইয়ং-এর স্থলে গর্ডনকে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয় তখন বিলাত থেকে সদ্য প্রত্যাগত গর্ডনের অত্যন্ত দুরবস্থা। দ্বারকানাথ গর্ডনের দুরবস্থা লাঘবের জন্য সেক্রেটারির বেতন ১,৬০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০০ টাকা করেন। এরূপ ভাবে বেতন বৃদ্ধি করার বিরোধী অংশীদারেরা এক বিশেষ সভায় বিষয়টির বিবেচনা দাবি করেছিল। কিন্তু উক্ত সভায় দ্বারকানাথের শক্তির কাছে বিরোধীরা ভোটে পরাজিত হয়।[৭৬] অবশ্য অংশীদারদের যে বিরাট অংশ বাইরে অবস্থান করত তাঁদের ভোটদানের কোন অধিকার ছিল না, কেননা অতীতে অনুপস্থিত অংশীদারদের (proxy vote) ভোট দেবার প্রস্তাব দ্বারকানাথ গোষ্ঠীর দ্বারা নাচক হয়ে যায়।[৭৭] এভাবে দ্বারকানাথই বস্তুত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং গর্ডনের আমলে যে অভিযোগ উঠেছিল—"যাঁহারা যত বেশী দেউলিয়া হইয়াছেন, তাঁহারাই তত ডিরেক্টর হইবার অধিকারী বিবেচিত হইতেন।"[৭৮] অথবা, "that the fittest persons to manage the affairs of the Bank were those who had been able most successfully to appropriate its funds."[৭৯]—সে বিষয়ে দ্বারকানাথের মতো ক্ষমতাশালী পরিচালক যে অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ঐ সব অবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারকামীদের

অন্যতম প্যাট্রিক ও'হ্যান্‌লন্‌ বলতে বাধ্য হন যে, দ্বারকানাথ সাত শ' শেয়ারের ক্ষমতাবলে গর্ডনকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।[৮০] আর এই গর্ডনই যখন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ছিলেন (১৮৪৩) তখন নীল ও চিনি ফ্যাক্টরিগুলিকে প্রদত্ত ৬১,৭৫,২৩১ টাকার ঋণ সহ হুণ্ডি ও জামিনে মোট ৯৩,৫৬,৪৮৯ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কের এক কোটি টাকার মূলধন থেকে। এই ঋণ আদায় হবে না জেনেও গর্ডন তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে ৭,৮৫,৭৩০ টাকা লাভ হয়েছে এবং শতকরা আট ভাগ লভ্যাংশ (dividend) বিতরণ করা হয় ব্যাঙ্কের চলতি জমা (floating deposits) থেকে।[৮১] শেষ পর্যন্ত অবশ্য গর্ডন বরখাস্ত হন এবং তাঁর জায়গায় ১৮৪৩-এর ডিসেম্বর মাসে জে. সি. স্টুয়ার্ট সেক্রেটারি হন। স্টুয়ার্টও যখন কিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাব করেন এবং এই তথ্য উত্থাপন করেন যে, চারটি এজেন্সী হাউস মিলে ব্যাঙ্কের মূলধনের দুই তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করেছে তখন গ্রান্ট (ব্যাঙ্কের ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান) স্টুয়ার্টকে লেখেন—"think them over before you stir matters which are somewhat of a gunpowdery nature."[৮২] সুতরাং কোন প্রকার সংস্কার সাধনে অক্ষম স্টুয়ার্ট ১৮৪৬ সালের শেষ দিকে সেক্রেটারির পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ স্বদেশে ছিলেন না এবং ১৮৪৫ সালে দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার পূর্বে দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অধিকাংশ শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিলেন (মাত্র ৫১টি শেয়ার শেষ পর্যন্ত ছিল)।[৮৩] এই কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। (At the January 1845 meeting the Reverend Morton congratulated Dwarkanath on recovering from his "late serious illness" and added, "in reference to that gentleman's acknowledged greatness as a commercial man, that whatever might have been his former position in the Union Bank, he was, at present, by no means the great Leviathan he had been; that he was not now a greater

Shareholder than many other persons, and that if he and all 'his tail' were to quit tomorrow, the loss would not be much, if at all, felt by the bank.")[৮৪]

তথাপি, দ্বারকানাথ ঠাকুর যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের রূপকারদের অন্যতম ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য, এদেশে ব্যাঙ্ক গঠনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত দ্বারকানাথই প্রথম নন। ইতঃপূর্বে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল (১৮০৯) -এর পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন রাজা সুখময় রায়, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (১৮১৯)-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র সূর্যকুমার ঠাকুর এবং ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক (১৮২৪)-এর উদ্যোক্তা-অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন রঘুরাম গোস্বামী।[৮৫] তবে এই সকল পূব দৃষ্টান্ত কোনক্রমেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের মুখ্য ও প্রত্যক্ষ ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস করে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে-সকল ইংরেজ দ্বারকানাথের সহযোগী ছিল তারা কোন ব্যবসায়িক সততায় বিশ্বাসী ছিল না। সে কারণেই, বোধ হয়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটার পর 'ক্যালকাটা রিভ্যু' (জানুয়ারি-জুন, ১৮৪৮)-এর পাতায় রেভারেণ্ড জন মার্শম্যান* তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে সংক্ষেপিত বিবরণমূলক এক নিবন্ধে ব্যাঙ্কের পতন ঘটার জন্য পরিচালকদের 'নির্বুদ্ধিতা ও জালিয়াতি'-কেই দায়ী করেছিলেন। উক্ত নিবন্ধে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা অসংযত জীবনযাত্রা ও উন্মত্ত ফটকাবাজীতে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল এবং তাদের নীতিবোধ ছিল কলুষিত, অভ্যাস দুর্নীতি-গ্রস্ত। বিবেকবর্জিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল ব্যবসায় ক্ষেত্রে

* Calcutta Review-তে প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধটির (Vol. IX, No. XVII, Jan.-June 1848, Art. V—Commercial Morality and Commercial Prospects in Bengal) রচনাকারের নামোল্লেখ নেই—ব্লেয়ার ক্লিঙ Rev. J. Marshman-কেই নিবন্ধকার বলে চিহ্নিত করেছেন।

এদের দক্ষতার পরিচয়। এই পরিচয় পাদ্রী মার্শম্যানের পছন্দ ছিল না। কারণ, "the character of Britain as a mercantile nation has been sullied, and the name of Christian has been dishonored in the presence of the heathen."[৮৬] কিন্তু সম্পদ লুণ্ঠনের আকর্ষণই যাদের এদেশে আসার একমাত্র কারণ তাদের আচরণ যীশুখ্রীষ্টের প্রতি এদেশে অনুরাগ সঞ্চারে ব্রতী পাদ্রী মার্শম্যানের কাছে বিঘ্নদায়ক মনে হলেও বস্তুত ঐ জাতীয় ইউরোপীয়রাই ছিল সর্বপ্রকারে প্রশ্রয়প্রাপ্ত এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিনা বেতনের প্রহরী। এই প্রহরী গোষ্ঠীরই কয়েকজন ধনাঢ্য দ্বারকানাথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ছায়ায়। (শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্যাবলী এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের যৌথ উদ্যোগের নামে স্থাপিত উক্ত ব্যাঙ্ক বস্তুত অর্থ আত্মসাতের খাজাঞ্চীখানায় পরিণত হয়েছিল।) সেজন্যই দেখা যায়, "ব্যাঙ্ক যেদিন টাকা দেওয়া বন্ধ করিল, সেদিন তাহার ক্যাসবাক্সে মোটে ৭৪০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। কোটী টাকার কি পরিণাম ?"[৮৭] অবশ্য এই পরিণাম প্রত্যক্ষ করার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর সেদিন জীবিত ছিলেন না। তবু দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি যেভাবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হ্রাস করে এনেছিলেন তা-ই সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যাঙ্কের আসন্ন পতন সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

॥ কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি ॥

কলকাতায় বাণিজ্য-কুঠি (Agency House) স্থাপনের পথ প্রদর্শক বস্তুত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতিপয় ভাগ্যান্বেষী ব্রিটিশ কর্মচারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৭৮০-র দশকে) কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে জনাকয়েক ইউরোপীয় এদেশে বাণিজ্য করতে প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে এরা যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তার

মধ্যে ছিল—সরকারের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ ব্যবস্থা, জমাকৃত অর্থে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়, নীলের কারবারে অর্থ লগ্নী করা, ইত্যাদি। এভাবে গঠিত কুঠির সংখ্যা ১৭৯০ সালে ছিল যেখানে পনেরটি, ১৮২৮ সালে হয় সেখানে সাতাশটি।[৮৮] কুঠির সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সে কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ সকল কুঠির বা বাণিজ্যকর্মের বিস্তার ঘটে—জাহাজ নির্মাণ, বিল (Bill) ভাঙানোর দালালি, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি গঠন, খনি সংক্রান্ত উদ্যোগ, সর্বোপরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ (Commercial Cultivation) বিশেষ করে নীল উৎপাদন। অল্প কয়েকজন এদেশীয় অংশীদার ব্যতিরেকে ঐ সকল বাণিজ্যিক সংস্থার মালিক ও পরিচালক ছিল ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোক। অবশেষে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে কলকাতার বেশ কয়েকটি বৃহৎ বাণিজ্য-কুঠির পতন ঘটলে* কলকাতার বাণিজ্য জগতে মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৮৯] কিন্তু এই মন্দা অবস্থা চলা কালেই ১৮৩৩ সালের নতুন সনদীয় ব্যবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার রহিত হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্য

* জন পামার অ্যাণ্ড কোং (১৮৩০), আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোং (১৮৩২), ম্যাকিণ্টশ অ্যাণ্ড কোং (১৮৩৩) এবং ১৮৩৪-এর জানুয়ারির মধ্যে ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোং, কলভিন অ্যাণ্ড কোং ও ক্রুটেণ্ডন অ্যাণ্ড কোং-এর পতন ঘটে। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সঙ্কলিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ বলা হয়েছে: "১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের হৌস, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্বপ্রথমে পামর কোম্পানির হৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্যন্ত কর্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে, তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সর্বসাধারণ লোকের ষোল কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে, দেউলিয়াদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি,

করার যে সুযোগ বৃদ্ধি পায় তার ফলে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। কারণ,১৮৩৪-৪৬ সময়কালের মধ্যে কলকাতায় বর্ধিত সংখ্যায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়েছে। (যথা, ১৮৩৫-এ ৬১টি, ১৮৪৬-এ ঐ সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৩টি)।[৯০] বাণিজ্যে উৎসাহ সঞ্চারী এই নতুন বাতাবরণকে লক্ষ্য করেই ২৭ আগস্ট ১৮৩৬ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল: "পাঠক মহাশয়দের মধ্যে কেহ ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাদুরের বাণিজ্য ত্যাগ করাতে ও বড় ২ বাণিজ্যের কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে বাণিজ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবেক ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যে ঐ অনিষ্ট বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে। এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বাহুল্যরূপে চলিতেছে এমন কখন দৃষ্ট হয় নাই।"[৯১]

এদেশীয়দের মধ্যে যাঁরা উপরি উক্ত নতুন পরিবেশে কলকাতায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভিন্ন আর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—মতিলাল শীল এবং রামগোপাল ঘোষ। রুস্তমজী-টার্নার কোম্পানি অবশ্য ১৮২৪ সালে গঠিত হয়েছিল।* ইউরোপীয় বা ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবচেয়ে বড় প্রয়াস হল Carr, Tagore and Company বা কার-ঠাকুর-কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। (দেওয়ান পদে ইস্তফা দিয়ে অংশীদারীর ভিত্তিতে দ্বারকানাথ এই বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন) ১ আগস্ট ১৮৩৪-এ উইলিয়ম কার ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের নামে উক্ত কুঠি স্থাপিত হয়।[৯২] কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলে পর ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন যে, "বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে

* টীকা 'জ' দ্রষ্টব্য

ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমাদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলঙ্ক ছিল তাঁহারা নির্বোধ ও নিষ্কর্ম্মা তা দূর করেন"।[৯৩] অন্য একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, বস্তুত 'কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'-র কাজকর্ম শুরু হয় অক্টোবর মাস থেকে; কারণ ৪ অক্টোবর ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল: "কার ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল।" এবং এই সংবাদেই দ্বারকানাথের নামোল্লেখ করে লেখা হয়েছিল যে, "এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়েরদেব ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্টী ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য অনেককালাবধি করিতেছেন।"[৯৪]

কার-ঠাকুর কোম্পানির অংশীদার উইলিয়ম কার-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় ঘটে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই। কারণ, ১৮২৪ সালে কার এদেশে আসেন এবং জন পামার অ্যাণ্ড কোম্পানিতে সহকারী হিসেবে চাকরি করে উক্ত কোম্পানির অংশীদার হন। ১৮২৯ সালে উইলিয়ম কার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। পামার কোম্পানির পতন (১৮৩০) ঘটার পর থেকে কার-ঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত উইলিয়ম কার নীলের ব্যবসায়ে দালালি করতেন। দ্বারকানাথ বেণ্টিঙ্কের কাছে ২০ আগষ্ট ১৮৩৪ তারিখের এক চিঠিতে* উইলিয়ম কার সম্পর্কে লেখেন:

* ১৮৩৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের 'সমাচার দর্পন'-এর সংবাদ থেকে জানা যায় বেণ্টিঙ্ক সমুদ্র পথ থেকে জুন মাসে দ্বারকানাথকে এই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে উক্ত সংবাদে লেখা হয়েছিল যে—"ঐ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি স্বীকারকরণ। এবং ঐ বাবু ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ি

"...gentleman who has for some years been favourably known to the commercial circles of Calcutta as joining, in his person, talents of the highest order and most varied description, with unblemished integrity, long experience in business, and a comlete knowledge of mercantile affairs."[৯৫] দ্বারকানাথ উক্ত চিঠিতে কার-ঠাকুর কোম্পানি স্থাপন সম্পর্কে বলেন যে, "It is so far a remarkable one in the commercial history of Bengal, as it is the first instance in which an open and avowed partnership has been established between European and the Bengal merchant with the capital of the latter..."[৯৬] এই চিঠিতেই দ্বারকানাথ আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর কুঠি কলকাতার প্রথমশ্রেণীর কুঠিগুলির সর্বাগ্রগণ্য যদি না-ও হয় অন্তত সমকক্ষ হবে এবং এ প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন যে, এর ফলে দেশের সৃজনশীল শক্তির বিকাশ ঘটবে।[৯৭] দ্বারকানাথের এই প্রত্যাশা কতটা ফলবতী হয়েছিল তা অনুধাবনের জন্য কার-ঠাকুর কোম্পানির ইতিহাস, সংক্ষিপ্তাকারে হলেও, পর্যালোচনা করা দরকার।

কার-ঠাকুর কোম্পানির দলিল প্রস্তুত করার সময়েই (১ আগষ্ট ১৮৩৪) দ্বারকানাথ কার-ঠাকুর কোম্পানিকে যে দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন তা নথিভুক্ত করা হয়। এই ঋণ শতকরা আট টাকা সুদে দেওয়া হয়েছিল এবং এই বাবতে দ্বারকানাথের প্রাপ্য সুদ বছরে আশি হাজার টাকা কোম্পানির লভ্যাংশ বহির্ভূত হিসাবে দেখান হতো।[৯৮] দ্বারকানাথ কোম্পানিকে শুধু মূলধন সরবরাহ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, অংশীদার বাছাইয়ের ব্যাপারেও তাঁর হাত ছিল। তিনি জীবিতকাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে এই কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। দ্বারকানাথের কর্তৃত্বের স্বরূপ ও শক্তি সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র

সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে ঐ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাঁহার প্রশংসা করণ।"

লিখেছেন : "বস্তুত অর্থসম্পর্কীয় বিভাগ পরিচালনায় তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা, এবং কোন অংশীদারকে তিনি সে-বিভাগের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে যে বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য ছিল, য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কে ও কুঠিতে তাঁর যে-অপরিমিত আমানত ছিল তার সাহায্যে তিনি অতি স্বল্প সময়ের নোটিশে সব সময় ক্ষুদ্র বৃহৎ সব রকমের ব্যবসায়িক দাবি মেটাতে সমর্থ হতেন।"[৯৯] অবশ্য কার-ঠাকুর কোম্পানির ইউরোপীয় অংশীদারদের* সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উইলিয়ম কারের বন্ধু উইলিয়ম প্রিন্সেপ প্রথমে একজন সহকারির পদে কোম্পানিতে যোগ দেন, পরে ১৮৩৬-এ অংশীদার হন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে ইহার অংশীদার হইয়াছিলেন।"[১০০] ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ডি. এম. গর্ডন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্মচারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। পরে গর্ডন অংশীদার হন, কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই কোম্পানির চাকরি ত্যাগ করে ওকালতি করেন। কার-ঠাকুরের অফিস প্রথমে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে (রানীমুদি গলির কোণে) ছিল, পরে হেস্টিংস স্ট্রীটের কাছে কলভিন ঘাটে উঠে যায়।[১০১]

কার-ঠাকুর কোম্পানি যদিও রপ্তানি বাণিজ্যের কুঠি (Exporting House) হিসেবে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কার্যত চীন থেকে রেশম ও বিলেত থেকে মদ আমদানি ছাড়াও এদেশের নানাবিধ ব্যবসার ক্ষেত্রে লিপ্ত ছিল—নীল, রেশম, চিনি, রাম (মদ), জমিদারি পরিচালনা (estate management) ও জাহাজ চলাচল ইত্যাদি।** কার ঠাকুর কোম্পানির সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত কারবার ছিল নীলের।

* টীকা 'খ' দ্রষ্টব্য।

** 'The "bread and butter" business of the firm was its export trade in raw silk, silk piece goods, indigo, sugar, rum, saltpeter, hides, timber and rice.'

সে কারণে এই কোম্পানির অফিসকে লোকে নীলের বাজার (Indigo Mart) বলেই জানত।[১০২] নীল উৎপাদনের সঙ্গে দ্বারকানাথ যে জমিদার হিসেবেও যুক্ত ছিলেন এবং তিনি যে সাতটি নীলকুঠির মালিক ছিলেন সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ সব নীলকুঠির পরিচালনার দায়-দায়িত্ব এই কোম্পানি গ্রহণ করে। (জমিদারি সম্পত্তিকে বাণিজ্যিক ব্যাপারে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা দ্বারকানাথের ছিল বলেই দেখা যায় কার-ঠাকুর কোম্পানি নীল, চিনি ও রেশমের রপ্তানি ব্যবসায়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার অধিকাংশের উৎপাদন ক্ষেত্র ছিল দ্বারকানাথের পৈতৃক জমিদারির অন্তর্গত বিরাহিমপুর অঞ্চলে)

(ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার নিষিদ্ধ হওয়ায় রেশম-কুঠিগুলি তারা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কার-ঠাকুর কোম্পানির আওতায় বস্তুত দ্বারকানাথ ঐ রেশমকুঠিগুলি ক্রয় করেন—১৮৩৫ সালে জঙ্গীপুরের কুঠি ৪৭,৩০০ টাকায় এবং দু'বছর দর কষাকষি করে ১৮৩৭ সালে কুমারখালির কেন্দ্রগুলি* ৮৪,৫০০ টাকায়) যদিও সরকারের বোর্ড অব ট্রেড শেষোক্ত রেশমকুঠিসমূহের মূল্য ধার্য করেছিল ১,৭৫,০০০ টাকা।[১০৩] এত সস্তায় কুমারখালির কুঠিগুলি বিক্রি হওয়াতে কোম্পানি-সরকারের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি (Resident) রিচার্ডসন উষ্মা প্রকাশ করে উপরওয়ালাকে লিখেছিলেন যে, "I have been upwards of forty years in the country and never dealt with such screws before."[১০৪]—বস্তুত এই মন্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন কার-ঠাকুর কোম্পানির কর্তাব্যক্তি দ্বারকানাথ ঠাকুর। কারণ অতীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কূট বুদ্ধির চয় রিচার্ডসন পেয়েছিলেন—যেহেতু এক সময় জমিদার দ্বারকা-

---

* কুমারখালির চারটি উৎপাদন কেন্দ্রে পাঁচ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এবং ১,৫০,০০০ ওজন পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হতো।

নাথের সঙ্গে যশোহরের প্রজাদের বাঁধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিবাদে এম্ব্যাঙ্ক-মেণ্ট কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে রিচার্ডসন সাহেবকেই সালিসি করতে হয়েছিল।[১০৫] নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অত্যাচারীর দলভুক্ত করা হয়েছে ; রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পাবনার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কুমারখালিতে কার-ঠাকুর কোম্পানির পেয়াদাদের অত্যাচার সম্পর্কে লিখেছিলেন : "কার-ঠাকুর কোম্পানির চাপরাশিরা 'C T & Co'-র ছাপ গায়ে লাগিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলার গুটিপোকার চাষীদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে রেশমের গুটি আটক করে এবং এই কোম্পানির কর্মচারীরা এমন মিথ্যা ধারণার বশবর্তী যে, তাদের প্রভুরা কুমারখালির কারখানাগুলি ক্রয় করার সঙ্গে এই ধরণের কিছু অতিরিক্ত অধিকারও অর্জন করেছে।[১০৬]

(চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।) দ্বারকানাথের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু অসফল এবং অনুল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত থাকলেও দ্বারকানাথই এদেশীয়দের মধ্যে আখের চাষ ও সেই সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রথম চিনি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। ১৮৩০ সালে চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণে বারিপুরে (বারুইপুর ?) চিনির কারখানা স্থাপন করে দ্বারকানাথ টি. এফ. হেন্‌লী নামে এক ইংরেজ ম্যানেজারের ওপর চিনি উৎপাদন কেন্দ্রের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আখ চাষ করে চিনি উৎপাদনের এই প্রচেষ্টায় দু' লক্ষ টাকা লোকসান হয়। তা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ পাবনার শিলাইদহে এবং পশ্চিমে গাজীপুর অঞ্চলে চিনি উৎপাদনের চেষ্টা করেছিলেন। সর্বত্রই ইউরোপীয় ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কোথাও এ বিষয়ে তাঁর প্রয়াস সফল হয় নি। অবশেষে আখ মাড়াই করে চিনি তৈরি করার পরিবর্তে গুড় কিনে চিনি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে দেখা যায়, ইউরোপীয় ম্যানেজারের অধীনে একমাত্র শিলাইদহ কারখানাই চিনি উৎপন্ন করে চলেছে।[১০৭] এ ছাড়া, ক্ষিতীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকানাথ রামনগরেও চিনির

কারখানা খুলেছিলেন।[১০৮] রায়নগরে (Rynuggur) দ্বারকানাথের 'রাম' (মদ) প্রস্তুতের কারখানা ছিল এবং এই কারখানার কর্তৃত্ব ছিল এস. এফ. রাইসের হাতে। এই মদ তৈরির বিষয়ে এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, বিদেশে মদ রপ্তানি করার জন্য চিনি উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট বর্জিত অংশকে কাজে লাগাবার উপায় হিসেবেই 'রাম' প্রস্তুত করা হতো। যা হোক, এই কেন্দ্রে বছরে পাঁচ হাজার গ্যালন মদ উৎপন্ন হতো।[১০৯] উৎপন্ন মদের কিয়দংশ যা নিম্নমানের বলে গণ্য হতো তা দেশী মদ হিসেবে বিক্রি করা হতো। কার-ঠাকুর কোম্পানি আবার বিলাত থেকেও পাইকারি দরে মদ আমদানি করত এবং খুচরা বিক্রিরও ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে দ্বারকানাথের অনুগত বিশ্বনাথ লাহাকে খুচরা ব্যবসায়ী করা হয়েছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : "কার-ঠাকুর কোম্পানীর সূত্রে দ্বারকানাথের একটি দুর্নাম* রটিয়াছিল —তিনিই কলিকাতায় নাকি মদ্যের স্রোত চালাইয়াছেন।"[১১০] ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আলোচনা সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন : "প্রকৃত কথা এই যে তিনি (দ্বারকানাথ) দেখিলেন যে মদ্যের আমদানি তো বাড়িতে চলিল, তবে তাহার লভ্যাংশ ইউরোপীয়গণ সমস্ত উপভোগ না করিয়া আমাদের দেশের লোকে যতটুকু উপভোগ করেন তাহাই দেশের ভাগ্য। এই কারণে তাঁহার এক অনুগত লোক বিশ্বনাথ লাহাকে মদ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।"[১১১] প্রসঙ্গত ক্ষিতীন্দ্রনাথ আরও

* এই দুর্নাম তৎকালে রসালো করেছিল বাগবাজারের 'রূপচাঁদ পক্ষী'-র একটি ব্যঙ্গাত্মক গান, যার প্রথম চার লাইন হল—

"কি মজা আছে রে লাল জলে
জানো ঠাকুর কোম্পানী।
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।"

উল্লেখ করেছেন যে, "এ দুর্নামেরও অন্যান্য দুর্নামের ন্যায় কারণ আছে। যখন গভর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে দ্বারকানাথ তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানে ভোজ দিতেন, তখন সেখানে যতকিছু মদ্য খরচ হইত তাহা তিনি কোন ইংরাজ সওদাগরের কাছে ক্রয় না করিয়া বিশ্বনাথ লাহার নিকটে ক্রয় করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের কাজ করিতেন।"[১১১]

কার-ঠাকুর কোম্পানি কলকাতার অন্যান্য বৃহৎ বাণিজ্য-কুঠির মতো জমিদারি সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। এই কোম্পানির অধীনে ছিল প্রথমত দ্বারকানাথের নিজস্ব জমিদারির বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, পাণ্ডুয়া ও শাহাজাদপুর; দ্বিতীয়ত ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের জমিদারি সম্পত্তি; তৃতীয়ত ফটকা ও অন্য ব্যবসায় স্বার্থে গৃহীত জমিজমা। ফটকা ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমির প্রায় সবগুলিই ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের—মণ্ডলঘাট, খাসপুর, স্বরূপপুর, মোহনগঞ্জ ও দ্বারবাসিনী। কার-ঠাকুর কোম্পানির পরিচালনাধীন জমিদারির রাজস্বের পরিমাণ ছিল বর্ধমানের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্বের ঠিক পরেই।[১১২]

রানীগঞ্জের কয়লা খনির ব্যবসায় দ্বারকানাথের অন্যতম কীর্তি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই উক্ত অঞ্চলে কয়লার অস্তিত্ব জানা গেলেও বস্তুত ১৮১৫ সালের পূর্বে নিয়মিত কয়লা উত্তোলনের কোন প্রয়াস দেখা দেয় নি। রানীগঞ্জে কয়লা খনির আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী ছিলেন উইলিয়ম জোন্‌স। ১৮২১-এ তাঁর মৃত্যু হলে আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানি উক্ত খনির মালিক হয় এবং ১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ আলেকজাণ্ডার কোম্পানির কাছ থেকে সত্তর হাজার টাকায় রানীগঞ্জ কয়লা খনি ক্রয় করেন।[১১৩] রানীগঞ্জ খনির পার্শ্ববর্তী চিনাকুরি কয়লা খনিটিও ১৮৩৭ সালে দ্বারকানাথ ক্রয় করেছিলেন।[১১৪] দ্বারকানাথ-সংশ্লিষ্ট সংস্থা সকল তো বটেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও রানীগঞ্জের কয়লা ক্রয় করত। তা ছাড়া, তৎকালের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজে রানীগঞ্জের কয়লাই বেশী ব্যবহার হতো এবং বিহার ও

উত্তরপ্রদেশে এই কয়লার ব্যাপক চাহিদা ছিল। বিলাত থেকে আমদানি করা কয়লাও দ্বারকানাথের সংস্থা সরবরাহ করত।[১১৫] কয়লার ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকা।[১১৬] রানীগঞ্জ ও চিনাকুরি ছাড়া কয়লা উত্তোলনের অপর ক্ষেত্র ছিল নারায়ণকুরি—এই খনির পরিচালক ছিল গিলমোর কোম্পানি। এই কোম্পানির পতন হলে গিলমোরের লণ্ডনস্থ পাওনা-দারগণ (যারা নারায়ণকুরি খনির তখন মালিক) কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্তভাবে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' স্থাপন করে (১৮৪৩)* এবং কার-ঠাকুর কোম্পানিই বেঙ্গল কোল কোম্পানির পরিচালনভার লাভ করে।[১১৭] এই কয়লা কোম্পানির খনির কাজে পাঁচ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এবং কলকাতায় কয়লা পরিবহনের কাজে নৌকার মাঝি-মাল্লা সহ আরও ন' হাজার কর্মচারী যুক্ত ছিল।[১১৮] কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, বেঙ্গল কোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্বারকানাথ এই কোম্পানি সম্পর্কে আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি। গঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি শেষ পর্য্যন্ত এরূপ নিরুৎসাহ হওয়া দ্বারকানাথের প্রকৃতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।* যদিও দ্বারকানাথের উদ্যোগসমূহের মধ্যে একমাত্র 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'-ই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তবে তা সম্ভব হয়েছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও ইউরোপীয়দের দ্বারা এই কোম্পানি অধিকৃত হওয়ার ফলে। কার-ঠাকুর কোম্পানির পতনের পর বেঙ্গল কোল কোম্পানি পরিচালনা করে গর্ডন, স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড কোং এবং পরবর্তী সময়ে নানা অবস্থা অতিক্রম করার পর উক্ত কোম্পানির পরিচালনভার অবশেষে 'অ্যাণ্ড্রু ইয়ুল' গ্রহণ করে (১৯০৮)।[১১৯] এই কয়লা কোম্পানি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে সরকারী স্বার্থ যে সক্রিয় ছিল সেকথা অনুধাবনীয়। কারণ এদেশে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখার এবং

টীকা 'ঞ' দ্রষ্টব্য

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রেল-স্টীমার চলাচল ও সরকারী প্রয়োজনে গঠিত সংস্থাসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কয়লা ছিল অপরিহার্য বস্তু।

পূর্বোক্ত বাণিজ্যকর্ম ব্যতীত কার-ঠাকুর কোম্পানি আরও যে-সকল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট বা কার্যনির্বাহী পরিচালক রূপে নিযুক্ত ছিল তাদের মধ্যে ক্যালকাটা স্টীম টাগ অ্যাসেসিয়েশন, স্টীম ফেরি ব্রীজ কোম্পানি, ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি ও বেঙ্গল টী অ্যাসোসিয়েশন অন্যতম। কলকাতা জাহাজ টানা সংস্থা (Calcutta Steam Tug Association) গড়ে ওঠার পূর্বে হুগলী নদীতে জাহাজ টানা কাজে লিপ্ত ছিল ম্যাকিণ্টশ কোম্পানি। ম্যাকিণ্টশের পতন ঘটাব পর ১৮৩৬ সালে ঐ কোম্পানির জাহাজ (Forbes) ১,১০,০০০ টাকায় দ্বারকানাথ ক্রয় করিছেলেন এবং ঐ বছরেই* কয়েকজন ব্যবসায়ীকে যুক্ত করে তিনি এই সংস্থা স্থাপন করেন।[১২০] সংস্থাটি যথেষ্ট লাভজনক হয়ে উঠেছিল এবং শেষপর্যন্ত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পরিচালনাধীনে সংস্থাটি দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ইংরেজ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বার বছর টিকে ছিল।[১২১] হুগলী নদী পারাপারের জন্য কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে খেয়া-সেতু (Ferry Bridge) স্থাপন করা দ্বারকানাথের আর এক কীর্তি। ডিঙ্গি নৌকায় পারাপারে সময়ের প্রশ্ন ছাড়াও ঝুঁকি ছিল। বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় (২৬ আগস্ট ১৮৩৯) খেয়া-সেতুর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। দ্বারকানাথ বিষয়টিকে রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন এবং ১৮৪০ সালে দু' লক্ষ টাকার মূলধনী ব্যবস্থায় খেয়া-সেতুর প্রতিষ্ঠানটি (Steam Ferry Bridge Company) স্থাপিত হয়।[১২২] গোড়ায় সংস্থাটি লাভজনক বলেই বিবেচিত হয়েছিল এবং সরকারী অনুমোদনও লাভ করেছিল। কিন্তু

* ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে উক্ত সংস্থা ১৮৩৭ সালে গঠিত হয়েছিল।

কার্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্থাটি পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি—দু'টি খেয়া জাহাজের স্থলে একটি দিয়ে কাজ শুরু হয়, কারণ বিলাত থেকে যে দু'টি জাহাজ (Tug) আনা হয়েছিল তার একটি ভগ্নাবস্থায় এসে পৌঁছায়। তারপর যে-স্থানে এই সেতু স্থাপন করার কথা তা নিয়ে ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানির আপত্তি থাকায় স্থান পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে এবং এই সঙ্গে ভাঙ্গা জাহাজটির মেরামত কার্য ইত্যাদির জন্য আরও অর্থলগ্নী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু এমতাবস্থায় অংশীদারগণ অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে সম্মত হয় না এবং ১৮৪২-এর জুন মাসে সংস্থাটিকে বিক্রি করে দেওয়ার সুপারিশ করে। ঐ বছরেই ১ আগস্ট অংশীদারদের এক সভায় উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আশি হাজার টাকার ফটকাবাজদের নিকট প্রতিষ্ঠানটির সম্পত্তি বিক্রি করা হয়।[১২৩] স্টীম ফেরি ব্রীজ কোম্পানির এরূপ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির জন্য অংশীদারগণ পরিচালকদের দোষ-ত্রুটিকেই দায়ী করেছিল. (The Steam Ferry Bridge Company, in the words of one irate shareholder, was "the last in a long series of unfortunate undertakings, all of which had failed through jobbery and bad management, causing ruin to many and loss to all who had supported them.")[১২৪] বস্তুত উদ্যমশীলতায় দ্বারকানাথের চমকপ্রদ স্বাক্ষর থাকলেও গড়ে ওঠা সংস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত হতাশায় বা নিন্দায় আক্রান্ত হয়েছে দেখা যায়। খেয়া-সেতুর আবির্ভাব জনজীবনের পক্ষেও প্রয়োজনীয় ছিল বলা যায়। কেননা হুগলী নদী পারাপারের সুবিধার্থে নির্মিত ভাসমান সেতুর জন্য ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং অবশেষে ১৯৪৩ সালে বর্তমান হাওড়া-সেতু নির্মিত হয়। যা হোক, প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, হুগলী নদীতে জাহাজ চলাচলের ব্যবসা ১৮০৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৮২৩ সালের ১৪ আগস্ট Calcutta Gazette-এ লেখা হয়েছিল—

'The steam vessel may now be daily seen in active operation on the Hooghly ; and groups of wondering natives, attracted by the novelty of the exhibition crowd both banks of the river to witness its surprizing manoeuvres."[১২৫] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাহাজ নির্মাণ বা জাহাজের মাধ্যমে বাণিজ্যবৃত্তিতে বাঙালীদের মধ্যে দ্বারকানাথ প্রথম নন। ১৭৬১ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে কলকাতায় ২৩৫টি জাহাজ নির্মিত হয়েছিল এবং সেগুলি এশীয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। এরূপ বাণিজ্যে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামদুলাল দে, রামগোপাল মল্লিক, পঞ্চু দত্ত ও মদন দত্ত উল্লেখযোগ্য। স্টীম বা বাষ্পীয় জাহাজের আবির্ভাব ঘটলে দেশীয় প্রথায় নির্মিত জাহাজ-শিল্পের অবনতি ঘটে।[১২৬]

কার-ঠাকুর কোম্পানি সামুদ্রিক জাহাজ-পরিবহন বাণিজ্যেও লিপ্ত ছিল। এগারটি জাহাজ এই কোম্পানির তদারকিতে ছিল—তার মধ্যে ছ'টি জাহাজের অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন দ্বারকানাথ, আর পাঁচটি ছিল অন্যান্যদের।[১২৭] ১৮৪৪ সালে কুড়ি লক্ষ টাকার মূলধনী পরিকল্পনায় ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টীম নেভিগেশন (IGSN) স্থাপিত হয়। দ্বারকানাথ উদ্যোক্তাদের একজন হলেও নিজে এই কোম্পানির পরিচালক-সদস্য ছিলেন না। রুস্তমজী কাওয়াসজী ভিন্ন পরিচালকদের সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। তবে ইউরোপীয় পরিচালকদের মধ্যে বেশ কয়েক জন দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "লেখাপড়ায় ইণ্ডিয়া জেনেরল ক্রমে কার-ঠাকুর হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া পড়িলেও প্রথমাবধি উভয় কোম্পানীর এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে জনসাধারণ ইণ্ডিয়া জেনেরলকে কার-ঠাকুরেরই এক কারবার বিভাগ বলিয়া জানিত।"[১২৮] এজন্য এই কোম্পানির জাহাজকে লোকে 'কার কোম্পানী কা জাহাজ' বা 'দোয়ারি বাবুকা জাহাজ' বলত।[১২৮] তা ছাড়া, দেখা যায়, দ্বারকানাথ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং খিদিরপুরে এই কোম্পানির জাহাজ মেরামতির কারখানাকেও লোকে

'কার-কোম্পানীর বাঁকশাল' বলে অভিহিত করত।[১২৯] এসব কিছু থেকে অনুমান করা করা যায়, দ্বারকানাথ কলকাতার শিল্প-বাণিজ্য জগতে কতখানি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দ্বারকানাথ Calcutta Chamber of Commerce-এরও সদস্য ছিলেন।*

সম্পদশালী ছিলেন বলেই, বোধ হয়, দ্বারকানাথকে অনেক সময় সংগঠিত উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা হতো। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির কথা। কারণ এরূপ একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেও দ্বারকানাথ কোম্পানির উন্নতি-অবনতিতে অনাগ্রহী ছিলেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি গঠন করার পশ্চাতে সক্রিয় ছিলেন দ্বারকানাথের সহযোগী উইলিয়ম প্রিন্সেপের ভাই জর্জ প্রিন্সেপ, যিনি বেলেঘাটা লবণ হ্রদ অঞ্চলে ও সাগরদ্বীপে লবণ তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৩৯ সালে লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উন্নতি-কল্পে জর্জ প্রিন্সেপই উক্ত সল্ট কোম্পানি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই কোম্পানির মূলধনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকা, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ধার্য হয়েছিল এক হাজার টাকা।** কিন্তু ঐ বছরেই

* টীকা 'ট' দ্রষ্টব্য।

** বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির বৃহৎ অংশীদারগণ :

Estate of George Prinsep	(500 shares)
William Prinsep	(300 ,,)
Theodore Dickens (Attorney)	(300 ,,)
H. Holroyd (Fergusson & Co.)	(200 ,,)
Dwarkanath Tagore	(200 ,,)
Debendranath Tagore	(120 ,,)
Bissumber Doss	(96 ,,)
Prassanna Kumar Tagore	(50 ,,)
Rustomjee Cowasjee	(50 ,,)
Motilal Seal	(50 ,,)
Ramanath Tagore	(20 ,,)

(Source—Blair B. Kling : Partner in Empire, p. 133.)

জর্জ প্রিন্সেপের মৃত্যু হলে উইলিয়ম প্রিন্সেপ কোম্পানির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৩০] অংশীদারদের মধ্যে ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও কার-ঠাকুর কোম্পানিই উক্ত সল্ট কোম্পানির পরিচালক হয়।[১৩১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লবণের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী ছিল তখন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। সরকারের লবণ, শুল্ক বোর্ডের অন্যতম কর্তাব্যক্তি এইচ. এম. পার্কার ছিলেন দ্বারকানাথের বন্ধুস্থানীয় এবং পার্কার বস্তুত বেঙ্গল সল্ট কোম্পানিকে সহায়তা দান করেছিলেন। সরকারকে লবণ বিক্রি করার অনুমতিও বিলেতের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি লাভ করেছিল।[১৩২] তা সত্ত্বেও এই কোম্পানি অব্যবস্থার জন্য ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে। অবশেষে ১৮৪৪ সালে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঠিত সংস্থাটিকে মাত্র বিশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।[১৩৩] সংস্থাটির এরূপ পরিণতির জন্য দ্বারকানাথ ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ উভয়ের সম্পর্কেই ঔদাসীন্যের অভিযোগ উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ব্লেয়ার ক্লিঙ যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "Tagore and the Prinseps, however, preferred to devote their energies elsewhere, yet prevented others from taking over the management. As a result, when the Government salt monopoly ended in 1863 no industry existed in Bengal to take advantage of it, and molunghee salt was replaced not by the product of a modern indigenous industry but by a flood of English salt."[১৩৪]

কার-ঠাকুর কোম্পানির পরিচালনাধীন আর একটি সংস্থা হল 'বেঙ্গল টী অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থাটি ছিল বস্তুত 'আসাম কোম্পানি'-র বাংলার শাখা। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক চা-উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন এবং সেই কমিটিতে এদেশীয়দের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল : "We have no hesitation in declaring this discovery...to be by far the most important

and valuable that has ever been made in matters connected with the agricultural or commercial resources of this empire."[১৩৫] ভবিষ্যতে ভারতীয় চা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতি কমিটির দূরদৃষ্টি প্রমাণ করলেও এদেশীয়দের দ্বারা চা-শিল্পে কোন আধিপত্য বিস্তৃত হয় নি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের কর্তৃত্বাধীন 'বেঙ্গল টী অ্যাসোসিয়েশন'-ও সাফল্যের কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারে নি। আসামের চা-উৎপাদন ও চা-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত 'আসাম কোম্পানি'-র মালিকানা ছিল লণ্ডনভিত্তিক। এদেশে উইলিয়ম প্রিন্সেপ এই কোম্পানির দায়িত্ব বহন করতেন। ১৮৪১ সালে কলকাতা বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে প্রিন্সেপ বিলাত চলে গেলে এক চতুর্থাংশের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানির ওপর কার-ঠাকুরের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়ে পড়ে।[১৩৬] এর দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয় যে, দ্বারকানাথ বস্তুত ইংরেজ বন্ধুদের সহায়তাকে বড় বেশী নির্ভরযোগ্য করে তুলেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে প্রিন্সেপের উপস্থিতিই যেন ছিল দ্বারকানাথের শক্তির উৎস। বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত এদেশে চা-শিল্পের উন্নতি ব্রিটিশ স্বার্থেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্রে আর এক নতুন পথ উন্মোচিত করে।

এদেশে রেলপথ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই প্রয়াস কয়লা পরিবহন করার স্বার্থসম্ভূত হলেও আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বারকানাথ যখন 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন অব বেঙ্গল' নামে একটি রেল কোম্পানি স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন তার অব্যবহিত পূর্বে আর. এম. স্টিফেন্সন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মাধ্যমে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে' কোম্পানি গঠনের কথা প্রচার করে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলের সমর্থন লাভে তৎপর হয়েছিলেন। অবশ্য দু'টি সংস্থাই লণ্ডনভিত্তিক ছিল এবং ১৮৪৪ সালে উদ্ভূত।[১৩৭] 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা ১৮৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশ করে

যে কার-ঠাকুর কোম্পানি কলকাতা থেকে রাজমহল পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব করেছে।[১৩৮] কিন্তু লণ্ডনে কর্তৃপক্ষের নিকট উভয় কোম্পানির তদ্বির-তদারকের শক্তি পরীক্ষায় দেখা যায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি, যার লক্ষ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিলাতী সুতীবস্ত্র আমদানির ও ভারত থেকে তুলা রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করা, ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী অনুমোদন লাভ করে এবং 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন' ঐ কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[১৩৯] তখন অবশ্য দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন না।

পূর্বোল্লিখিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও দ্বারকানাথ বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়্যারহাউস অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেক ইউরোপীয় পরিচালনাধীন সংস্থার শেয়ার ক্রয় করেছিলেন, যথা—(নিউ) ফোর্ট গ্লস্টার মিলস্, হোপ রিভার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, গ্লোব ইনস্যুরেন্স ও অ্যালায়েন্স ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি।[১৪০] ব্যবসায় জগতে দ্বারকানাথের সংশ্লিষ্টতার স্বরূপ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, পাটোয়ারি বুদ্ধিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে তৎকালেব ইংরেজ সওদাগরদেরও হার মানিয়েছেন। আর ঠাকুর পরিবারের ভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সময়ের উপস্থিতির কথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকেও জানা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার যখন বিলাত যান, মহর্ষি লিখেছেন, "তখন তাহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের মধ্যাহ্ন সময়।"[১৪১] কার-ঠাকুর কোম্পানি সম্পর্কে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে, "এই কুঠীর কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটি সর্বপ্রধান ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বে এবং তাঁহার আদেশে দগ্ধীভূত হওয়াতে এই কারবার যে কত বিস্তৃত ছিল এবং কিরূপে পরিচালিত

হইত, তাহার বিবরণ উদ্ধার করিবার কোন আশা নাই। যাহাই হউক আমরা দু একটি টুকরো কাগজ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই গড়ে দৈনিক পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষ টাকার কারবার চলিতে দেখিয়াছি। একালে ইহা তত বড় কথা না হইলেও সেকালে একজন দেশীয়ের পক্ষে ইহা কম কথা ছিল না।"[১৪২] বস্তুতই কম কথা ছিল না, তবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লেখিত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ভিন্ন ঐতিহ্যের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পিতামহের কীর্তিকলাপ পীড়াদায়ক বলে গণ্য হয়েছিল বলেই কি তিনি উক্ত ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট নথিপত্র বিনষ্ট করায় তৎপর হয়েছিলেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন: "১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর।"[১৪৩] এই স্মৃতি-তথ্যের সঙ্গে কার-ঠাকুর কোম্পানির পতনের সন-তারিখের* যদিও সর্বত্র মিল দেখা যায় না, তবু ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডির দাবি মেটাতে অক্ষম হওয়ায় কার-ঠাকুর কোম্পানির দরজা যে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪৪] বস্তুত কার-ঠাকুর কোম্পানির সম্পত্তির সামর্থ্যানুযায়ী** এইভাবে কোম্পানির পতন ঘটার কোন হেতু ছিল না। তবে কার-ঠাকুর কোম্পানির "অর্দ্ধেক অংশ ছিল দ্বারকানাথের, আর বাকি অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ"[১৪৫] হওয়ায় দ্বারকানাথের অনুপস্থিতিতেও (১৮৪৬ সালের

---

* "১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারির Calcutta Gazette থেকে জানা যায়, "১২ জানুয়ারী ১৮৪৮ সালে 'কার-ঠাকুর কোম্পানী' উঠে যায়।"

(সূত্র—কিশোরীচাঁদ মিত্র: দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্গানুবাদ, প্রসঙ্গ কথা, পৃ. ২৬৬)

** Total assets, pledged and unpledged Rs. 29,02,950

Total Liabilities, covered and uncovered Rs. 25,46,000

(Source—Blair B. Kling : Partner in Empire, 1981, p. 239)

১ আগস্ট লণ্ডনে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়) ইংরেজ অংশীদাররা অর্থ আত্মসাতেই মগ্ন ছিল। পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ যখন কোম্পানির কার্য দেখাশোনা করছিলেন তখন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকেও এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে—সাহেব অংশীদাররা এক পয়সাও দেয় না, কেবল লাভের ভাগী হয়।[১৪৬] কার-ঠাকুর কোম্পানি সংশ্লিষ্ট দ্বারকানাথের সহযোগী ইংরেজ অংশীদারদের প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বারকানাথ-পর্যালোচক ক্লিঙ বলেছেন: "Carr, Tagore and Company, for example, was not truly a partnership of equals. Dwarkanath established the house and invited Carr, Prinsep, and other impecunious British merchants to join in the use of his capital. They had nothing to lose and everything to gain by accepting his offer, and they left for home as soon as possible."[১৪৭] পক্ষান্তরে, ইংরেজ বা ইউরোপীয়দের সঙ্গে দ্বারকানাথের সাহচর্যকে আন্তঃ জাতীয় (inter racial) সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস বলেও বিবেচনা করা যায় না। কারণ, কার্যত শাসকজাতির বংশধরেরা এদেশে এসেছিল অর্থ সংগ্রহের লালসায় এবং এই লালসা চরিতার্থ করার জন্যই তারা প্রভাবশালী-বিত্তবান এদেশীয়দের সঙ্গে মেলা-মেশায় ও তাঁদের সাহায্য লাভে আগ্রহ দেখাত। দ্বারকানাথ তাদের এই আগ্রহকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং এই আলিঙ্গন ছিল এক তরফা—কারণ, ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এদেশীয়দের সমমর্যাদায় গ্রহণ করার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না; বাস্তবেও তারা শাসকজাতির স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নি। সেজন্য দ্বারকানাথ কর্তৃক ইংরেজ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গঠন করাকে ইংরেজ ও এদেশীয়দের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াস বলে মর্যাদা দেওয়া যায় না। এই বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করতে না পেরেই, বোধ হয়, ব্লেয়ার ক্লিঙকে মন্তব্য করতে হয়েছে যে—"Dwarkanath labored in vain, for the British would not accept genuine partnership with an Indian."[১৪৮] তবে দ্বারকানাথ বৃথাই শ্রম করেছেন, এই

ধারণা যথার্থ নয়। ইংরেজ সাহচর্যে দ্বারকানাথের উদ্যোগসমূহ সহজাত ব্যর্থতার আধার হিসেবে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ-সাহচর্যই যে আবার তাঁর ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদের উপায়স্বরূপ ছিল সেটা অতীব বাস্তব সত্য।

দ্বারকানাথের কালে শিল্প-বাণিজ্য-উদ্যোগ সকল যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উপায় হিসেবেই সক্রিয় ছিল তার স্বাক্ষর বহন করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ তথা উত্থান-পতন। ইউরোপীয় বণিকরা অর্থ সংগ্রহের লোভেই এদেশে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন সৃষ্টি করত বা ঐ জাতীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতো, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নয় বা ঔপনিবেশিক স্বার্থবিরোধী কোন প্রয়াসে ব্রতী হওয়ার জন্যও নয়। সুতরাং এই বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করে ঔপনিবেশিক শোষণের বেসরকারী হাতিয়ারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণিজ্য করার প্রবণতা বিদেশী শাসন-সৃষ্ট অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ব্যক্তিগতভাবে এরূপ সুযোগ গ্রহণের প্রয়াস হিসেবেই তৎকালে শিল্প-বাণিজ্য-উদ্যোগ সকল গড়ে উঠেছিল। কলকাতার বাণিজ্য-কুঠি ব্যবসায় ১৮৩০ এর দশকেই যে শুধু সঙ্কটের আবর্তে পড়েছিল তা নয়, ১৮৪০ এর দশকেও আবার এক বৃহৎ সঙ্কটের মুখে অনেক বাণিজ্য-কুঠির পতন ঘটেছিল। কলকাতার বাণিজ্য জগতের এরূপ উত্থান-পতনের কালে নানাবিধ উদ্যোগের দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু বিগত শতকের তিরিশ-চল্লিশ দশকের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগপ্রবাহকে 'age of enterprise' বা 'industrial revolution' বলে চিহ্নিত করাকে বাস্তবসম্মত বলা যায় না।* শিল্প-বিপ্লবের কোন

---

* 'If the dynamism of the "age of enterprise" had been sustained, if the industrial revolution of the 1840s had not been aborted, eastern India might have developed indigenous industries commensurate with its natural and human resources.'

পটভূমিই তখন রচিত হয় নি। বরং তৎকালে বাণিজ্য-ব্যবসায় সকল যে সাময়িক অর্থ লুণ্ঠনের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েছিল তা দ্বারকানাথের মতো উচ্চকোটির ব্যবসায় উদ্যোগীর দ্বারা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস থেকেও অনুধাবন করা যায়। বস্তুত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থের মূল নীতি ছিল—ব্রিটেনের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতবর্ষকে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিণত করা ("That Hindoostan must be made a vast estate for raising of crude agricultural productions for the manufactories of Britain.")[১৪৯] এই ব্রিটিশ স্বার্থের কথা দ্বারকানাথের আমলে গোপন ছিল না, এবং পরবর্তী কালেও ব্রিটিশ সরকার ঐ নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নি। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থক ইংরেজ গোষ্ঠীর তথাকথিত প্রগতিশীলতাও ছিল উক্ত ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবাধ-বাণিজ্যপ্রেমীদের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পথ সুগম করে নিজ নিজ সমৃদ্ধির সোপান রচনা করা। সে কারণে, বিদেশী অবাধ-বাণিজ্য প্রেমিকের দল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার রহিত হলেও যেমন এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে এগিয়ে আসে নি, তেমনি ইংরেজদের এদেশে স্থায়ী বসবাসের সরকারী বাধা দূর হলেও* সম্প্রদায়গতভাবে এদেশে বসবাসে আগ্রহী হয় নি। অথচ সেকালে প্রগতিশীলতার নামে, উদারপন্থার নামে এই ইংরেজসম্প্রদায়ের প্রতিই দ্বারকানাথ সহ এদেশের উদারপন্থীরা ঘনিষ্ঠতার হাত প্রসারিত করেছিলেন, পূর্বোক্ত বাস্তব সত্যের প্রতি চোখ বুজে থেকে।** ব্রিটিশ স্বার্থের স্বরূপ উপলব্ধিতে অনাগ্রহ বা

---

* "European ownership of land had already been allowed by Amherst and liberally extended by Bentinck."

(Amales Tripathi: Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833, Calcutta, 1956, pp. 248-49).

** "...he (দ্বারকানাথ) closed his eyes to the full implications of a movement grounded in the concept of an industrialized

অক্ষমতাই দ্বারকানাথকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের পরিপোষক রূপে সৃষ্টি করেছিল এবং সেই স্বার্থেরই আবর্তে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের শক্তিশালী প্রয়াস সকল সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অথচ, দ্বারকানাথের আমলেও লক্ষ্য করা যায়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হেতু দু-চার জন ইউরোপীয় এদেশে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলায় আগ্রহী হয়েছিলেন।* তাঁদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি এমন নয়। কারণ, ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখতে এদেশের শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নীতি। ("There was opposition from the manufacturing interest, which saw in colonization the spectre of a second Lanchashire on the bank of the Ganges, which could beat the original with cheap Indian labour and raw material.')'[১৫০] আর সরকারীভাবে প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়—বিলাতের কাগজ উৎপাদন-শিল্পের প্রতিযোগী

England supported by agricultural colonies. It was, in fact free-trade imperialism that would frustrate the industrial development that he and his British partners were to promote with such vigor in the thirties and forties."

(Blair B. Kling : Partner in Empire, Calcutta, 1981 p. 72.)

* অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জেসফ কোম্পানীর উদ্যোগ ছাড়াও উইলিয়ম জোন্সের হাওড়ায় 'ক্যানভাস' তৈরির কারখানা (১৮১০), কার্ট্রিজ কাগজ কারখানা (১৮১১), লৌহ কারখানা (১৮১০) ও কয়লা উৎপাদন প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, ফোর্ট গ্লস্টারের শিল্প-কারখানাসমূহ, যথা—কটন মিল (১৮১৭), লৌহ কারখানা, মদ তৈরির কারখানা, তেল কল, কাগজের মিল ইত্যাদি। (Blair B. Kling : Partner in Empire, Calcutta 1981, pp. 64-66).

১ এই সকল শিল্পোদ্যোগ কলকাতাকে কেন্দ্র করে হুগলী নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধরে গড়ে উঠেছিল। এই সকল দৃষ্টান্তের পাশাপাশি এদেশীয় উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষনীয়।

হওয়ায় কোম্পানি সরকার হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত (১৮১১) উইলিয়ম জোন্‌সের কার্ট্রিজ কাগজের উৎপাদন কেন্দ্রকে অসহযোগিতার দ্বারা নিরুৎসাহিত করেছিল ; ফলে ঐ কাগজের কল বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু এই জোন্‌স-ই যখন ১৮১৫ সালে রানীগঞ্জে কয়লাখনির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিলেন তখন সরকার স্বীয় স্বার্থে সেই প্রয়াসের বিরোধিতা করে নি।[১৫১] তবে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উদ্‌যোগেরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যেমন—১৮১৭ (?) সালে স্থাপিত ফোর্ট গ্লস্টার কটন মিলে বিলাত থেকে নারী শ্রমিক এনে নিযুক্ত করা, মির্জাপুর থেকে তুলা এনে সুতো উৎপন্ন করা, মাত্র একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের অধীনে বাঙালী ও উড়িয়া শ্রমিক নিয়ে মিল পরিচালনা করা। এই মিল হস্তান্তরিত হয়ে ১৮৩৩ সালে যখন (নিউ) ফোর্ট গ্লস্টার পুনর্গঠিত হয়েছিল তখন দ্বারকানাথ এই কোম্পানির দ্বাদশাংশ শেয়ার ক্রয় করেছিলেন।[১৫২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কাপড়ের মিল পরিদর্শন করে মাদ্রাজ থেকে আগত একজন রাজকর্মচারী (I. Everett) মন্তব্য করেছিলেন যে. তুলার প্রাচুর্য ও সস্তা শ্রমশক্তির সাহায্যে স্থানীয় সুতীবস্ত্রের মিল ইউরোপীয় উৎপাদন ব্যতিরেকেই পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের সমগ্র না হলেও অধিকাংশ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ব্রিটিশ নীতির প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, বাংলার দাবি ল্যাঙ্কেশায়ারের মত আনুকূল্য পাবে না, কারণ (তাদের মতে) ভারতবর্ষ একটা উপনিবেশ ছাড়া কিছু নয়। ["It (ভারত) goes by the unhappy name of colony, a place...made expressly to be plundered by the Mother country."][১৫৩]

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে যে, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তৎকালে এদেশে শিল্প গড়ে তোলার যতটুকু সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিল এদেশীয় বিত্তবান-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে সেই সম্ভাবনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হন নি কেন? এর উত্তরে সেই পশ্চাৎ ইতিহাসের দিকে তাকালে এই ধারণাই জন্মায় যে,

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতি ও স্বার্থের পরিপন্থী উদ্যমের পথ ছিল বন্ধুর ও জটিল, আশু সাফল্য ছিল সুদূর পরাহত। সংঘাত এড়িয়ে উপনিবেশবাদী ইংরেজ সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়ার পথ ছিল অনেক বেশী নিরাপদ, আশু সাফল্য অর্জনের সহজ পথ। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত পথ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পরিচর্যার পথ। আর সে-পথেই দ্বারকানাথ আপন সমৃদ্ধির সোপান রচনা করেছিলেন।

✓ তবে একথা অনস্বীকার্য যে, নির্বাচিত কর্মসীমার মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। আর্থিক সঙ্গতি, সাংগঠনিক ক্ষমতা, আধুনিক মানসিকতা ও অধ্যবসায় তাঁর চরিত্রে উদ্যোগের নেতৃত্ব গ্রহণ করার স্পর্ধা সঞ্চার করেছিল। এই স্পর্ধার বলেই তিনি 'কার, টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি'-কে একটি প্রথম শ্রেণীর সংগঠনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আর সহযোগী ইংরেজরা আপাত গরজে দ্বারকানাথের প্রভাব-স্পর্ধাকে মেনে নিতে যে বাধ্য হতো তার পরিচয় বিভিন্ন সংস্থার নীতি-পন্থা নির্ধারণে দ্বারকানাথের ভূমিকার মধ্যেই বিদ্যমান। (অবশ্য, দ্বারকানাথের বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ জমিদারি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপে দৃঢ়তা দান করেছিল। বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন দ্বারকানাথ জমিদারির নিরাপদ আশ্রয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন নি, বরং শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়-এ লিপ্ত দ্বারকানাথ জমিদারি সম্পত্তি বৃদ্ধি করেই চলেছিলেন।) ব্লেয়ার ক্লিঙের মতে, "The dual nature of his economic activities gave him his financial resiliency: among merchants he was a zamindar and among zamindars a merchant."[১৫৪] ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহও দ্বারকানাথের শিল্প-বাণিজ্য কর্মের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন: 'He (দ্বারকানাথ) also purchased zamindaries and sought to combine the role of an enlightened zamindar with that of a

modern entrepreneur."[১৫৫] এই ছবি দ্বারকানাথের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভূসম্পত্তির স্বার্থ-চেতনা ও আধুনিক শিল্প-সংগঠনের দাবি পরস্পর বিপরীত ধর্মী। সেজন্য আলোকপ্রাপ্ত হলেও একজন জমিদারের পক্ষে শিল্পবিস্তারের দায়িত্ব পালন করা অবশেষে সম্ভব হয় না। দ্বারকানাথের পক্ষেও তা সম্ভবপর হয় নি। আর শেষ পর্যন্ত দ্বারকানাথের মধ্যে যে 'একজন জমিদার'-এর বৈশিষ্ট্যই বেশী-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তাঁর জীবন-আচরণ সে সাক্ষ্যই বহন করে।

সূত্রসূচি

১. Marx, K. and Engels, F.: Selected Works,

২. Dutt, Romesh : The Economic History of India, Vol. I, New Delhi 1976, p. 177.

৩. Ibid, p. 180.

৪. Sinha, N. K. The Economic History of Bengal, Vol. III,

৫. Dutt, Romesh : op. cit., Vol. I, p. 202.

৬. Sinha, N. K. : op. cit., Vol. III, p. 11.

৭. Ibid, p. 10.

৮. Ibid, p. 4.

৯. Marx, Karl : Articles on India, (Article : The British Rule in India, *New York Daily Tribune*, June 25, 1853), Bombay 1945, p. 22.

১০. Dutt, Romesh : op, cit., Vol. I, p. 202.

১১. Sinha, N. K. : op. cit., Vol. III, pp. 9-10.

১২. Dutt, Romesh : op. cit., Vol. I, p. 205.

১৩. Sinha, N. K. : op. cit., Vol. III, p. 7.

১৪. Ibid. p. 9.

১৫. Marx, Karl : Capital, Vol. I, Moscow 1954. p. 432.

১৬. Dutt, Romesh : op. cit.,:Vol. I, p. 212.

১৭. Marx,:Karl : Articles on India, Bombay 1945, p. 22.

১৮. Kling, Blair B. :

১৯. Ibid, p. 41.

২০. Ibid, p. 55.

২১. Ibid, p. 53.

২২. Ibid, p. 91.

২৩. Ibid, p. 76.

২৪. কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর, পৃ ৬১।

২৫. Kling, op. cit., p. 58.

২৬. Kripalani, Krishna : Dwarkanath Tagore.

২৭. Kling, op. cit., pp. 58-59 ; Kripalani, K : op. cit., p. 85.

২৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, কলিকাতা ১৩৭৬, পৃ ১৭৫।

২৯. Kling, op. cit., pp. 43-44 and 61-62.

৩০. Ibid. p. 41.

৩১. Ibid, p. 42.

৩২. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সঙ্কলিত, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৮৪, পৃ ৩৩৭।

৩৩. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৪২।

৩৪. The Days of John Company (Selections from Calcutta Gazette 1824-32), ed. A. C. Das Gupta, Calcutta 1959, p. 449.

৩৫. Ibid, pp. 449-51.

৩৬. Ibid, p. 383.
৩৭. Ibid, pp. 384-85.
৩৮. Sinha, op. cit., p. 64.
৩৯. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, কলিকাতা ১৩৭৭, পৃ ৩৪৭।
৪০. ঐ, পৃ ৩৪৬।
৪১. Kling, op. cit., p. 43.
৪২. স. সে. ক., ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৭।
৪৩. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ২৬৯ (প্রসঙ্গকথা)।
৪৪. ঐ, পৃ ১৬।
৪৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৪২।
৪৬. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ২৬৮-৬৯ (প্রসঙ্গকথা)।
৪৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৪৪।
৪৮. Sinha, op. cit., p. 64 ; The Days of John Company, pp. 450-51.
৪৯. Kling, op. cit., p. 199.
৫০. Ibid, p. 42 ; কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ১৬ ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৪০।
৫১. Kling, op. cit., p. 200.
৫২. Ibid, p. 199.
৫৩. Ibid, p. 200.
৫৪. Sinha, op. cit., p. 65.
৫৫. Kling, op. cit., p. 205.
৫৬. Ibid, p. 77.
৫৭. Ibid, p. 44.
৫৮. Ibid, p. 45.
৫৯. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৫২।
৬০. ঐ, পৃ ১৫৩।
৬১. ঐ, পৃ ১৫৪।
৬২. ঐ।
৬৩. ঐ, পৃ ১৫৮।
৬৪. Sinha, op. cit., p. 123.

৬৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৫৬।

৬৬. ঐ।

৬৭. Sinha, op., cit., p. 65.

৬৮. Kling, op. cit., p. 86 (f.n. 43).

৬৯. Ibid, p. 213.

৭০. Sinha, op. cit., pp. 123-24.

৭১. Kling, op. cit., p. 205 ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ১৪৫ ১৪

৭২. Sinha, op. cit., p. 123.

৭৩. Kling, op. cit., p. 212.

৭৪. Sinha, op. cit., p. 123.

৭৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৫৯।

৭৬. Kling, op. cit., p. 206.

৭৭. Ibid, pp. 205-206.

৭৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৬০।

৭৯. Kling, op. cit., p. 207.

৮০. Ibid, p. 208.

৮১. Ibid, p. 209-10.

৮২. Ibid, p. 212.

৮৩. Sinha, op. cit., p. 120.

৮৪. Kling, op. cit., p. 212.

৮৫. স. সে. ক., ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৮ ; কিশোরীচাঁদ, ঐ পৃ ২৬৬ (প্রসঙ্গকথা)।

৮৬. Calcutta Review : Art. V—Commercial Morality and Commercial Prospects in Bengal, Vol. IX, No. XVII. Jan.—Jun. 1848.

৮৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৫৯।

৮৮. Kling, op. cit., p. 54.

৮৯. স. সে. ক., ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৮-৩৯ ; Sinha, op. cit., p. 26. Kling, op. cit., p. 43.

৯০. Kling, op. cit., p. 54.

৯১. স. সে. ক., ২য় খণ্ড, পৃ ৩৪৭।

৯২. Kling, op. cit., p. 73 ; কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ২৬৬।

৯৩. স. সে. ক., ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৯-৪০।

৯৪. ঐ, পৃ ৩৪০।

৯৫. Kling, op. cit., p. 78.

৯৬. Tripathi, Amales : Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833, Calcutta 1956, pp. 250-51.

৯৭. Kling, op. cit., p. 73.

৯৮. Ibid, p. 77.

৯৯. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ১৫-১৬।

১০০. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১০২।

১০১. ঐ, ১০৩ ; Kling, op. cit., p. 92.

১০২. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১০৪।

১০৩. Kling, op. cit., pp. 84-85.

১০৪. Ibid, p. 86.

১০৫. Ibid.

১০৬. Ibid.

১০৭. Ibid, pp. 87-88.

১০৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১০৪।

১০৯. Kling, op. cit., p. 89.

১১০. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১১৮।

১১১. ঐ, পৃ ১১৯।

১১২. Kling, op. cit., pp. 89-90,

১১৩. Ibid, p. 94 ; স.সে. ক., ২য় খণ্ড, পৃ ৩৫৭।

১১৪. Kling, op. cit., p. 96.

১১৫. Ibid, p. 112.

১১৬. Ibid, p. 105 (f.n. 37)

১১৭. Ibid, p. 101.

১১৮. Ibid, p. 114.

১১৯. Ibid, p. 120.

১২০. Ibid, p. 124.

১২১. Ibid, p. 129.

১২২. The Bengal Hurkaru, 26 Aug. 1839 & 8 July 1840.

১২৩. Ibid, 17 June and 3 Aug. 1842 ; Kling, op. cit., p. 143.

১২৪. Kling, op. cit., p. 143.

১২৫. Wilson, C. R. and Carey, W.H. : Glimpses of the Olden Times, ed. A. Mookerji, Calcutta 1968, pp. 188-89.

১২৬. History of Bengal, ed. N.K. Sinha, Calcutta 1967, p. 121.

১২৭. Kling, op. cit., p. 90.

১২৮. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১১০-১১, ১১৮ ; Kling, op. cit., p. 189.

১২৯. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১১১।

১৩০. Kling, op. cit., pp. 131-132.

১৩১. Kling, op. cit., p. 132.

১৩২. Ibid, pp. 133-34.

১৩৩. Ibid, p. 136.

১৩৪. Ibid, p. 137.

১৩৫. Griffiths, Percival : The British Impact on India, London 1952, p. 451.

১৩৬. Kling, op. cit., pp. 147, 151-52.

১৩৭. Ibid, pp. 194-95.

১৩৮. Kripalani, op. cit., p. 85.

১৩৯. Kling, op. cit., p. 196.

১৪০. Ibid, p. 66 ; Sinha, op. cit., p. 117.

১৪১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১০৪।

১৪২. ঐ, পৃ ১০৩।

১৪৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ ৮৫।

১৪৪. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১২৩ ; Kling, op. cit., p. 238.

১৪৫. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১২১।

১৪৬. ঐ, পৃ ১২২।

১৪৭. Kling, op. cit., p. 251.

১৪৮. Ibid, p. 252.

১৪৯. The Days of John Company. p. 508.

১৫০. Tripathi, op. cit., p. 228.

১৫১. Kling, op. cit., p. 64.

১৫২. Ibid, pp. 66, 224.

১৫৩. Ibid, p. 71 (Ref.—I. Everett : Observations on India by a Resident There of many years, London, 1853).

১৫৪. Ibid, p. 31.

১৫৫. Sinha, op. cit., p. 119.

৩

সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সামাজিক পরিবর্তন বা সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে রামমোহন-নেতৃত্ব সমাজের যে-অংশের কাছে দিশারী বলে প্রতিভাত হয়েছিল, বলা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর সে-অংশেরই একজন পুরোধা। সামাজিক ক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের ভূমিকা কতটা রামমোহন-প্রভাবিত তা পর্যালোচনার পূর্বে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হল—একদিকে যেমন শিল্পোদ্‌যোগী দ্বারকানাথকে বিংশ শতাব্দীর টাটা-বিড়লা ও তত্তুল্য ব্যক্তিদের প্রায় পূর্বসূরী বলে নির্দিষ্ট করার প্রবণতা বিদ্যমান,* অন্যদিকে তেমনি দ্বারকানাথকে সে-যুগের 'একজন কীর্তিমান পুরুষ' বলে চিত্রণের মানসে জমিদার-দেওয়ান-শিল্পোদ্‌যোগী দ্বারকানাথকে অন্তরাল করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। এরূপ প্রয়াসের বশবর্তী হয়েই যেন দ্বারকানাথ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি যে কর্মকুশলতা দেখিয়েছিলেন ও প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তারই একটা জনশ্রুতি এ কাল পর্যন্ত গুঞ্জিত হচ্ছে। অথচ এই পরিচয় দ্বারকানাথের যথার্থ পরিচয় আদবেই নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রতিটি সমস্যার সমাধানে দ্বারকানাথ সে যুগের পুরোগামীদের অন্যতম। রামমোহনের পরে দ্বারকানাথই সে যুগের বাংলার সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেশভক্ত পুরুষ। এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে

দ্বারকানাথের সাহচর্য না পেলে রামমোহনের বহু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত।"[১] এটা অত্যুক্তি কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর; কারণ অত্যুক্তি-অনত্যুক্তির মীমাংসা-উপকরণ এখানে যেহেতু দ্বারকানাথের জীবন ও কর্মধারা সেজন্য রামমোহন-সহযোগী দ্বারকানাথের ভূমিকা আলোচনা করাই শ্রেয়।

॥ রামমোহন-সহযোগী দ্বারকানাথ ॥

রামমোহন রায় যখন স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য কলকাতায় আগমন করেন তখন দ্বারকানাথ একুশ বছরে পদার্পণ করেছেন। ঘটনাক্রম সাক্ষ্য দেয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ* ছিলেন; কিন্তু কখন থেকে এবং কীভাবে দ্বারকানাথ ও রামমোহনের মধ্যে প্রথমাবস্থায় সংযোগ ঘটেছিল সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত উল্লেখ সত্ত্বেও, বোধ হয়, একথা বলাই সঙ্গত যে, আত্মীয় সভার সূত্রেই রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।**[২] রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে যে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সভায় শুধু ধর্মালোচনাই হতো না, নানা প্রকার সামাজিক বিষয়ও আলোচনায় স্থান পেত।[৩] দ্বারকানাথ যদিও আত্মীয় সভার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন তবুও রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে দ্বারকানাথের বড় একটা সংযোগ ছিল না। ১৮২১ সালে রামমোহন যখন পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডামের সঙ্গে একেশ্বরবাদী ভাবধারায় ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন করেছিলেন তখন দ্বারকানাথ উক্ত কমিটির সদস্য হয়েছিলেন।[৪] আবার ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি

মাসে (৬ ফাল্গুন ১২২৯) 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠাকল্পে হিন্দুস্কুলে যে সভা হয়েছিল সেখানে রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। দ্বারকানাথ গৌড়ীয় সমাজের বিধায়কদের মধ্যেও একজন ছিলেন এবং সমাজকে আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। বস্তুত গৌড়ীয় সমাজ (Native Literary Society) বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের স্বার্থ রক্ষা করা। এই সমাজের সভায় বেদ পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। ১৮২৪-এর পর এই সমাজের কার্যকলাপ সম্পর্কে আর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৫]

বৈষয়িক জীবনের চর্চায় রামমোহন ও দ্বারকানাথের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে। উভয়েই জমিদার ছিলেন, তেজারতি কারবার করতেন এবং সরকারী চাকরি করেছেন।[৬] সামাজিক ক্ষেত্রেও উভয়ে উভয়ের আকর্ষণ অনুভব করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উভয়ে সহযোগীরূপে অবতীর্ণও হয়েছেন। তবে দ্বারকানাথের ভূমিকায় প্রারম্ভে রামমোহন সংশ্লিষ্ট তার প্রভাব লক্ষিত হলেও শেষ পর্যন্ত দ্বারকানাথের ভূমিকা আপন বৈশিষ্ট্যাবলম্বিত বলেই প্রতীয়মান হয়। ১৮২৮ সালে যখন 'ব্রহ্মসভা' (পরে 'ব্রাহ্ম সমাজ' নাম হয়) স্থাপিত হয় তখন দ্বারকানাথ উক্ত সভার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন ; কারণ দেখা যায়, ১৮২৯ সালে উপাসনা গৃহ নির্মাণের জন্য চিৎপুরে যখন জমি ক্রয় করা হয়েছিল তখন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যে পাঁচ জনের নাম জমির কবলায় স্থান পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথও ছিলেন। অবশ্য ১৮৩০ সালে সমাজ গৃহ নির্মিত হওয়ার পর যে ট্রাস্ট ডীড্ করা হয়েছিল সেই দলিলে যে তিন জনের নাম ছিল তাঁরা হলেন—রমানাথ ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ রায়।[৭] দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিলেও পোষাক-পরিচ্ছদে এবং চিন্তায় নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথের পরামর্শেই

ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলায় উপাসনা করা এবং বেদপাঠ, ব্রাহ্মণবিদায় ও দেশীয় ভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা সমাজে গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৮] রামমোহনের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে দ্বারকানাথ যে হিন্দুধর্মের আচারনিষ্ঠা থেকে দূরে সরে যান নি তার উল্লেখ রয়েছে তৎকালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়: "শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে।"[৯] প্রথম জীবনে তিনি নিজ হাতে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নিত্য পূজা করতেন। পরে অবশ্য ম্লেচ্ছ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তিনি পারিবারিক পূজা-পার্বণের জন্য আঠারজন বেতনভুক পূজারী নিয়োগ করেছিলেন।[১০] কারও কারও মতে রামমোহনের দৃষ্টান্তেই তিনি বিধর্মী জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। মুসলমান বাবুর্চির হাতে খানাপিনা ও সাহেব-মেম ঘেষা জীবন-যাত্রার জন্য জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও পরিবারের লোকজন দ্বারকানাথের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করে দ্বারকানাথ আলাদাভাবে বাস করতেন; এবং এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, স্ত্রী দিগম্বরী দেবী নিয়মিত স্বামী-সেবার কাজ করে গেলেও শুদ্ধাচারিণী ছিলেন বলে স্বামীর সংস্পর্শে এলে গঙ্গা জলে স্নান করে শুদ্ধ হতেন।[১১] দ্বারকানাথের নিত্য জীবনযাত্রায় হিন্দুয়ানির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলেও তিনি ব্রাহ্মধর্ম বা অন্য ধর্মমতের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন নি। অবশ্য, দ্বারকানাথ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের যেমন প্রতিবাদী হন নি, তেমন আবার ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক সংকটে সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হন নি। বরং রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম যাতে বজায় থাকে সেজন্য তিনি দীর্ঘদিন উক্ত সমাজের আর্থিক ব্যয় বহন করেছিলেন। রামমোহনের শিক্ষানীতির প্রতি সহমর্মিতা হেতু তিনি দেবেন্দ্রনাথকে প্রথমে হিন্দুস্কুলে

ভর্তি না করে রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে (Anglo-Hindu School) প্রেরণ করেছিলেন।[১২] পরে ১৮৩১ সালে হিন্দুস্কুলে ভর্তি করেছিলেন।

দ্বারকানাথ সতীদাহ-প্রথা রহিত করার প্রচেষ্টায় রামমোহনের সঙ্গে এক বিশিষ্ট সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সহমরণ নিষিদ্ধ করে এক আইন (Regulation XVII of 1829) জারি করলে কলকাতার এদেশীয় প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেন্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়েছিল সেই পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথও ছিলেন।[১৩] ১৮৪২ সালে লেডি বেন্টিঙ্ক দ্বারকানাথকে একটি পত্রে সহমরণ-প্রথা নিবারণে রামমোহন ও দ্বারকানাথের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—"কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে আপনি এবং স্বর্গত রামমোহন রায়ই সব চেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে বহুকাল প্রচলিত থাকার ফলে এই বীভৎস সংস্কার আইনের আকার ধারণ করেছে, আসলে এ অনুষ্ঠান (সতীদাহ) হিন্দুদের শাস্ত্রানুমোদিত নয়।"[১৪] বস্তুত সহমরণ-প্রথা দূর করার বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের যুক্ত থাকা যে বাহ্যিক ব্যাপার ছিল না, যথেষ্ট ঐকান্তিক ছিল তা বোঝা যায় পরবর্তী কালের একটি ঘটনা থেকে। সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধকারী আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করে ব্যর্থ 'ধর্মসভা' পক্ষ উক্ত আপীলের সাহায্যকারী ম্যাকডুগাল সাহেবের প্রাপ্য টাকা নয় বছর পরেও শোধ করে নি। এমতাবস্থায় দ্বারকানাথের বন্ধুস্থানীয় স্টর্ম দ্বারকানাথকে তাঁর ও দেশের সুনাম রক্ষার্থে ম্যাকডুগালের প্রাপ্য টাকা আদায় করে বা চাঁদা তুলে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথ জানিয়েছিলেন: সতীদাহের মতো একটা পৈশাচিক প্রথার সপক্ষে আপীল সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য তিনি বা কোন প্রকৃত মনুষ্য কণামাত্র

সাহায্য করবেন স্টর্ম যেন ক্ষণিকের জন্যও সেকথা না ভাবেন।[১৫]

অবাধ বাণিজ্য (free trade) এবং ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস (colonization) নিয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথের কালে কলকাতায় বেশ আলোড়ন উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই দু'টি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ, অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতারাই এদেশে ইউরোপীযদের অবাধে বাস করার সুযোগদানেব পক্ষপাতী ছিল। রামমোহন-দ্বারকানাথের কাছে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলোপের দাবিদার ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তখন প্রগতিশীল বলে গণ্য, সুতরাং উভয়েই এই ইংরেজ গোষ্ঠীর দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।* তৎকালে ইংরেজদেব সঙ্গে ব্যবসার স্বার্থে জড়িত এবং নিজেদের প্রগতিশীল বলে প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছুক অল্পসংখ্যক এদেশীয় ব্যক্তি ভিন্ন অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের মধ্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদেরই প্রাবল্য ছিল। অন্যদিকে রক্ষণশীল বলে গণ্য জমিদারশ্রেণীর অধিকাংশ কালোনাইজেশনের বিরোধী ছিলেন। বিরোধীদের যুক্তি ছিল ইংরেজদের এদেশে অবাধে বসবাস করতে দিলে একদিকে যেমন সামাজিক সুস্থিতি বিপন্ন হবে এবং জমিদারি-রায়তী ব্যবস্থা ধ্বংস হবে; অন্যদিকে তেমনি জীবিকা অর্জনে সহায়ক স্বদেশী শিল্পসমূহ বিনষ্ট হবে। বিরোধী পক্ষ গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের দৌরাত্ম্য ও তাদের দ্বারা চাষাবাদের যে ক্ষতি হচ্ছে সে সব দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিল।[১৬] এদেশীয়দের এই বিরোধিতা ছাড়াও তৎকালের ব্যাপটিস্ট মিশনের সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাও কলোনাইজেশনের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছিল।[১৭]

*'Rammohun and his progressive circle of friends including Dwarkanath Tagore, Prasannakumar Tagore and others had uniformly been emphatic supporters of free trade and the import of European "character and capital" into India.' (S. D. Collet : The life and Letters of Raja Rammohun Roy, ed. Biswas and Ganguli,

৮

কলকাতার বিশপ হেবার সাহেবও শুধু নীলকরদের অত্যাচারকে নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি ভারত সরকারের হাতে এদেশ থেকে ইউরোপীয়দের বিতাড়ন করার ক্ষমতা থাকারও পক্ষপাতী ছিলেন, বোধ হয় এই কারণে যে, ইউরোপ থেকে আগত এক জাতীয় বিদেশীরা ছিল, তাঁর মতে, এই বিশ্বে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্মীছাড়া-লম্পটের দল। (হেবারের ভাষায়: "the greatest profligates the sun ever saw—")[১৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকার এদেশ থেকে অত্যাচারী ইউরোপীনদের বিতাড়নের চেয়ে বেশী উৎসাহী ছিল সরকারের কার্যকলাপেব সমালোচক ইংরেজ বা ইউরোপীয়দের বিতাড়ন করায়। (যেমন, উক্ত কারণে 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক বাকিংহামকে ১৮২৩ সালে বিতাড়ন করা হয়েছিল)। যা হোক, রামমোহন-দ্বারকানাথ কিন্তু এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাস সম্পর্কে তাঁদের যুক্তির সমর্থনে নীলকরদের কার্যকলাপকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। দ্বারকানাথের মত ছিল, নীলকরদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সাধিত হয়েছে, নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং তারা পূর্বের চেয়ে সুখে দিনপাত করছে। দ্বারকানাথ এই অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন যে, ব্রিটিশ কলা-কৌশল ও মূলধন এদেশে নিয়োজিত হলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটবে এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে এদেশীয়দের পারস্পরিক মিশ্রণ ব্যতীত এই উন্নতি ঘটা সম্ভব নয়। রামমোহন এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের সমর্থনে নীলকরদের অবদান সম্পর্কে দ্বারকানাথেব সঙ্গে মূলত সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। অবশ্য, মননশীল রামমোহন এরূপ প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, "the greater the intercourse with European gentlemen the greater will be our improvement in literary, social and political affairs"*[১৯] অবাধ বাণিজ্যাধিকার

---

* ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় colonization-এর প্রশ্নে দ্বারকানাথ ও রামমোহন সংশ্লিষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

ও ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়িভাবে বসবাসের প্রশ্নে রামমোহন-দ্বারকানাথের প্রত্যাশা বাস্তবে সার্থকতা লাভ করে নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ১৮৩৩ সালের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত হয়েছিল, এবং ইউরোপীয়রা এদেশে বসবাসের সুযোগও পেয়েছিল; কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইউরোপীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যেমন এদেশের স্বার্থে কোন উন্নতি ঘটাতে উদ্যোগী হয় নি তেমনি সম্প্রদায়গতভাবেও তারা এদেশে বসতি স্থাপন করে এদেশবাসীর সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে তৎপর হয় নি। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ ব্যবসা-স্বার্থে ও আধুনিকতার আস্বাদনে ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলেই, বোধ হয়, তৎকালের অবাধ বাণিজ্য ও কলোনাইজেশনের সমর্থক ব্রিটিশদের মূল স্বার্থ ও অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন থাকার অবকাশ পান নি। ১৮৩৩ সালের নতুন সনদীয় ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক স্বাধীনতার সুযোগ কীভাবে দ্বারকানাথ গ্রহণ করেছিলেন সে তথ্য পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কাছে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ছিল এদেশে অবাধ লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, আর তারা যে কলোনাইজেশন প্রার্থনা করেছিল তার কারণ ছিল এদেশে নিজেদের অবস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ সংশ্লিষ্টতায় আগ্রহী এদেশের বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের আকাঙ্ক্ষাকে উক্ত বিষয়ে জাগ্রত রেখে তাদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করা।

সংবাদপত্র প্রকাশে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথের সংশ্লিষ্টতা ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। একাধিক ভাষায় সংবাদপত্র (দ্বিভাষিক 'ব্রাহ্মণ সেবধি,' বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী,' পারসীতে 'মিরাত-উল-আখ্‌বর,' ত্রৈভাষিক 'বঙ্গদূত' এবং ইংরাজীতে 'বেঙ্গল হেরাল্ড'*) প্রকাশের অগ্রদূত ছিলেন

* ' "ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী—এই চারি ভাষায় 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য ৭নং বাঁশতলা গলির সার্জ্জন

অবশ্য রাজা রামমোহন রায়। সংবাদপত্র প্রকাশে দ্বারকানাথ রামমোহন রায়কে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য দিতে কুণ্ঠা করেন নি। ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল অ্যাডাম যখন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য আইন (Regulation III of 1823) প্রণয়ন করেছিলেন তখন সেই আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের নিকট এ বিষয়ে প্রতিবিধান প্রার্থনা করে যে দরখাস্ত প্রেরণ করা হয়েছিল সে দরখাস্তে স্বাক্ষকারীদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন ছাড়াও দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[২০*] সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে রামমোহন সরকারী আইনের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন সে সম্পর্কে রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় (১৮৩৪) বলা হয়েছিল: "a man born and bred in Britain could not have come forward more completely heart and soul in support of that which was the cause of his country, that Rammohan Roy did in 1823."[২১] রামমোহনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সংক্রান্ত

আইনের পরিবর্তন সাধিত হয় নি। তবে উক্ত সময়কালে লর্ড আমহার্স্ট ও লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক কঠোরভাবে প্রেস আইনের প্রয়োগও হয়নি।

শুধু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নয়, রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পূর্বে ১৮১৬ সালের স্ট্যাম্প আইন ও জুরি আইন, ১৮২৮ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি বিষয়ক আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে রামমোহনের সঙ্গে দ্বারাকানাথ একত্র প্রতিবাদ-আবেদনে সামিল হয়েছিলেন। অবশ্য তখন এই সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে সামাজের প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় গোষ্ঠীই সোচ্চার হয়েছিলেন। স্ট্যাম্প আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ী, বিত্তবান ও জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল, যদিও সরকার সেই প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করে নি। জুরি আইনের ক্ষেত্রে প্রতি-বাদের মাত্রা প্রায় সার্বিক স্তরে পৌছেছিল। ১৮২৬ সালের পূর্বে শুধু ইউরোপীয়রাই জুরির তালিকায় স্থান পেত। ১৮২৬-এর জুরি আইনে এদেশীয়দের সীমিত স্থান লাভ ঘটলেও উক্ত জুরি আইনের ধারা জাতি-বৈষম্যমূলক ছিল। এই জুরি আইনে পেটি জুরি (Petty Jury) ও গ্র্যাণ্ড জুরি (Grand Jury) ব্যবস্থায় এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানের গ্র্যাণ্ড জুরিতে তো স্থান ছিলই না, পরন্তু পেটি জুরিতেও হিন্দু-মুসলমান জুরিদের খ্রীস্টান আসামীর বিচার করার অধিকার ছিল না। অন্যদিকে খ্রীস্টান জুরিরাই কেবল গ্র্যাণ্ড জুরিতে স্থান লাভ করেছিল এবং পেটি জুরিতেও খ্রীস্টান জুরিরা সকল সম্প্রদায়ের আসামীর বিচার করার ক্ষমতা লাভ করেছিল। এরূপ জাতি-বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় মিলিতভাবে ১৮২৮ সালে পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করেছিল। উক্ত আবেদনে ১২৮ জন হিন্দু ও ১১৬ জন মুসলমান স্বাক্ষর করেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়।[২২] উনিশ শতকের ভাবধারার জনৈক গবেষকের মতে—"The petition was the first Indian public indictment of British rule."[২৩] ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ

বিষয়ে যে নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে তাতে ঐ জাতিগত বৈষম্য দূর করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে ভারতীয়রা 'জাস্টিস অব দি পীস' হওয়ার অধিকারও লাভ করেছিল। ১৮৩৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব, রসময় দত্ত প্রভৃতি গ্র্যাণ্ড জুরির তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন এবং ১৮৩৫ সালে এদেশীয়দের মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম 'জাস্টিস অব দি পীস' হয়েছিলেন।[২৪]

১৮২৮ সালের লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের (Regulation III of 1828) বিরুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেলের নিকট যে আবেদন করা হয়েছিল সেখানে হিন্দু-মুসলমান জমিদারগণ সহ ২০৯ জন স্বাক্ষরকারী ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৫] এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন দেব ও রসময় দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে প্রগতিশীল রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরও ছিলেন। উক্ত আবেদনে রামমোহনের স্বাক্ষরদান সম্পর্কে একটি গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে—"Rammohan Roy may have put his signature to the petition more out of his regard for his zamindar-business-man friends like Dwarkanath Tagore than from his own conviction."[২৬] এরূপ মন্তব্যের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, রামমোহন এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন ; কেননা পরিবর্তী কালে বিলাতে বোর্ড অব কন্ট্রোল-এর কাছে রামমোহন অনুরুদ্ধ হয়ে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটির কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বস্তুত উক্ত প্রতিবেদনে রামমোহন জমিদারি-বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করেন নি, রায়তদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সে কারণে তৎকালীন জমিদারি-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ তাঁর উন্নত মানসিকতারই প্রতিফলন বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৮২৮-২৯ সালে কলকাতা-সমাজে রামমোহনের অবস্থান ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুলনায় ভিন্ন মাত্রার। কারণ সতীদাহ-প্রথা

নিবারণে ও ব্রাহ্মসমাজ গঠনে রামমোহন আপন বিশ্বাসের যে-পথ তখন সৃষ্টি করে চলেছিলেন সেখানে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতার দ্বারা তিনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, দ্বারকানাথ বুদ্ধিমার্গীয় সামাজিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন না বলে সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর সংশ্লেষ-বিশ্লেষ ছিল মূলত অনাক্রান্ত। সুতরাং লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে যে আবেদন করা হয়েছিল সেখানে দ্বারকানাথের মতো জমিদার-ব্যবসায়ী বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতি রামমোহনকে স্বাক্ষরদানে প্রবৃত্ত করেছিল এরূপ অনুমান হয়ত করা যায়, কারণ রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রামমোহনের মনে তখন দ্বিধা থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তা ছাড়া, যুগধারায় ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি রামমোহন রায় ঐকান্তিক বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকদের চৈতন্য উৎপাদনে রামমোহন তুলনামূলকভাবে এদেশে মুসলমান শাসন সম্পর্কে দ্বারকানাথ থেকে ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। রামমোহনের মতে, "মুসলমানাধীনে এদেশীয়রা মুসলমানদের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করত; কারণ, হিন্দুরা উচ্চতর পদে স্থান পেত, সেনাপতি হতে পারত, শাসকদের উপদেষ্টার পদও লাভ করত—এসব বিষয়ে ধর্মীয় বা জন্মগত কারণে অনুপযুক্ততা বা মর্যাদাহানিকর পার্থক্য দেখা দিত না।···ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয়রা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে।"[২৭] মুসলমান আমল সম্পর্কে দ্বারকানাথ পরবর্তী কালে, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে হলেও, যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সেখানে তিনি মুসলমান শাসনকে অজ্ঞ, অসহিষ্ণু ও উচ্ছৃঙ্খল সামরিকতার বাহক বলেছেন। এবং এদেশের চরিত্রে শঠতা ও বঞ্চনার স্ফূর্তি মুসলমান আমলের অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। তুলনামূলকভাবে তিনি ব্রিটিশ শাসনের আবির্ভাবকে পরিবর্তনের বাহক বলে নির্দেশ করে ইংরেজ সাযুজ্যই (ভাষা, আইন, শিক্ষা বিষয়ে) উন্নতির কারণ বলে আস্থা প্রকাশ

করেছেন।[২৮] অবশ্য ভারতের ভবিষ্যৎ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকাতেই নিরাপদ এ বিষয়ে রামমোহনও দ্বারকানাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে মুসলমান আমল সম্পর্কে রামমোহন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন বলেই, বোধ হয়, মোগল বাদশার কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব লাভ করায় এবং মোগল বাদশার আয় বৃদ্ধিকল্পে বিলাতে দৌত্য করায় তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

১৮৩৩ সালে (২৭ সেপ্টেম্বর) বিলাতে রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে রামমোহন-দ্বারকাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অবসান ঘটে বলা যায়। রামমোহন জীবনের শেষাবস্থায় যে-আর্থিক সঙ্কটে পড়েছিলেন এবং রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে যে প্রয়াস হয়েছিল সে সম্পর্কে দ্বারকানাথের ভূমিকা আলোচনার অপেক্ষা রাখে ; বিশেষত এ বিষয়ে যখন প্রশ্ন উথাপিত হয়েছে। উল্লেখ পাওয়া যায়, ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ম্যাকিণ্টশ কোম্পানি (এই কোম্পানির সঙ্গে রামমোহনের আথিক স্বার্থ জড়িত ছিল) দেউলিয়া হলে রামমোহন তীব্র আথিক সঙ্কটে পড়েন। কিন্তু দ্বারকানাথের উক্ত কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, উক্ত কোম্পানির নিজস্ব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কেরও একজন প্রভাবশালী অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথ। তা ছাড়া, পূর্বে উল্লেখিত তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, ম্যাকিণ্টশ কোম্পানির পতনের পর দ্বারকানাথ উক্ত কোম্পানির নানা বিষয়-আশয়ের (যথা—ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, মণ্ডলঘাটের সম্পত্তি এবং ম্যাকিণ্টশের অংশীদারের কাছ থেকে জাহাজ ইত্যাদি) মালিক হয়েছিলেন। সে কারণে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, দ্বারকানাথ বন্ধুর স্বার্থরক্ষার জন্য কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ? বিলাতে দ্বারকানাথের পরিচিত সূত্রের অভাব না থাকা সত্ত্বেও তিনি কি রামমোহনের দুরবস্থায় কোন সাহায্য পাঠিয়েছিলেন বা সাহায্যের প্রস্তাব করেছিলেন ?[২৯] প্রশ্নগুলি অবান্তর নয়, কারণ আর্থিক সঙ্কটের ফলেই রামমোহনের শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্ত ত্বরান্বিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। "The

financial anxiety thus caused was a source of humiliation to a proud man and is said to have hastened his death")[৩০] দ্বারকানাথ বহুস্থলে রামমোহন রায়কে তাঁর সুহৃদ বলে উল্লেখ করেছেন, এমন কি দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচারণকারীরাও রামমোহনের উল্লেখ না করে দ্বারকানাথ সম্পর্কে ভাবতে পারেন নি দেখা যায়।[৩১] এত সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও কিন্তু বিলাতে দুরবস্থায় পতিত রামমোহন কলকাতার ধনাঢ্য বন্ধু দ্বারকানাথের কাছ থেকে কোন সাহায্য লাভ করেছিলেন বলে তথ্য অনুপস্থিত।

অবশ্য, রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার প্রয়াসের সঙ্গে দ্বারকানাথ নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি রামমোহন অনুরাগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্মৃতি ভাণ্ডারও গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজে এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথের নামে চাঁদা দেওয়া হয়েছিল পাঁচ শত টাকা। রামমোহনের স্মৃতি তহবিলে লর্ড বেন্টিঙ্ক পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিয়ে রামমোহনের নামে কোন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হলে বেন্টিঙ্ক আরও আর্থিক সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আট হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল।[৩২] কিন্তু ১৮৪২ সালেও উক্ত চাঁদার অর্থ রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার কাজে ব্যয়িত না হওয়ায় 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বেঙ্গল হেরাল্ড' প্রভৃতি পত্রিকায় নানা মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৩] রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার এরূপ পরিণতি বিস্ময়ের সন্দেহ নেই। তবে ১৮৪২ সালে বিলাত গমন করে দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের সমাধির ওপর স্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সমস্ত কর্মকাণ্ডের লীলাভূমি কলকাতায় তখন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোন সৌধ বা স্তম্ভ নির্মিত হয় নি। অথচ, রামমোহনের মৃত্যু সংবাদে দ্বারকানাথ শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৪] এসব কারণে রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে দ্বারকানাথের ঔদাসীন্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর ব্যাখ্যা বা গবেষণার বিষয় হলেও এ সম্পর্কে দ্বারকানাথ ঠাকুরের

জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনির বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য বলেই মনে হয়। কৃপালনি বলেছেন : "It is difficult to explain Dwarkanath's inactivity or indifference in this matter. On the death of his mother in 1838, he had donated in her memory a lakh of rupees (at that period a fabulous amount) to the District Charitable Society of Calcutta, besides spending nearly fifty thousand on her *shraddha*. For his mother's memory to whom he did not owe his birth, he did so much, but for his friend's memory to whom he owed his moral and intellectual inspiration, his rebirth as it were, he failed to do what was needed."[৩৫]

॥ সংবাদপত্র / মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ॥

কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "দ্বারকানাথ বিশ্বাস করতেন মুদ্রাযন্ত্র হল দেশের উন্নতির পক্ষে একটি শক্তিমান অস্ত্র"।[৩৬] হয়তো এরূপ বিশ্বাস ছিল বলেই দ্বারকানাথ তৎকালের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেছিলেন মূলত আর্থিক সহায়তা দ্বারা। দ্বারকানাথ ১৮২৯ সালে রামমোহন রায়ের সঙ্গে একত্রে ইংরাজীতে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ও বাংলা ভাষায় 'বঙ্গদূত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকারও একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন দ্বারকানাথ—এই পত্রিকার অপর অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন কর্নেল ইয়ং এবং স্যামুয়েল স্মিথ। দ্বারকানাথ ম্যাকিন্টশ কোম্পানির কাগজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' কিনে নিয়ে হরকরা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। তা ছাড়া, তৎকালের প্রখ্যাত সাংবাদিক স্টকলার যখন 'জন বুল' পত্রিকার স্বত্ব কিনে 'ইংলিশম্যান' নাম দিয়ে ঐ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তখন স্টকলারকে দ্বারকানাথ আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।*[৩৭] ঠাকুর পরিবারের অনেকেই এবং সেই সঙ্গে

---

* টীকা 'ভ' দ্রষ্টব্য।

দ্বারকানাথ ঠাকুরও 'সংবাদ প্রভাকর'-কে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।[৩৮] ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, "১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীরামপুর হইতে মার্সম্যান সাহেব প্রভৃতি মিশনারীগণ 'সমাচার দর্পন' নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।" এবং "১৮২১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামমোহন রায়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তাহা জীবিত ছিল।"[৩৯] বস্তুত 'সম্বাদ কৌমুদী' রামমোহনই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; আর 'সমাচার-দর্পণ'-এর সঙ্গে দ্বারকানাথের গ্রাহক হওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল, রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর রামমোহন-পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় যখন 'সম্বাদ কৌমুদী'-র প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দ্বারকানাথ আর্থিক সাহায্য করেছিলেন; এবং দ্বারকানাথ ছিলেন "One of the first subscribers to the Serampore paper" (*Samachar Darpan*).[৪০]

উপরি উক্ত তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, তৎকালের সংবাদপত্র জগতে দ্বারকানাথের বলিষ্ঠ অবস্থান ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামমোহন রায়ের সঙ্গে দ্বারকানাথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হননকারী সরকারী নীতির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন, "দ্বারকানাথ অনুভব করেছিলেন, সংবাপত্র যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয় তাহলে দেশের প্রগতির জন্যে তা আরো শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হতে পারে।"[৪১] কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতা দানকারী মেটকাফ-প্রবর্তিত যে বিধিকে দ্বারকানাথ অভিনন্দিত করেছিলেন তা মোটেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দেয় নি। বস্তুত মেকলে-মেটকাফ প্রবর্তিত নতুন প্রেস আইনের লক্ষ্য ছিল, এদেশে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন মত প্রকাশের

প্রতি উদারতা দেখানো এবং সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থরক্ষায় উক্ত আইন ছিল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের একটি বিকল্প প্রয়াস। এই বিকল্প প্রয়াসের সূত্রপাত ঘটে ১৮৩৪ সালে টি.বি. মেকলে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের একজন সদস্য হওয়ার পরে। বেন্টিঙ্কের বিদায় গ্রহণের পূর্বে ১৮৩৫-এর ৫ জানুয়ারি টাউন হলে কলকাতার অধিবাসীদের এক সভায় প্রেস রেগুলেশন ও জনসভার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং নতুন সনদ কার্যকরী করার বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন পাঠানোর প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। এই সভায় এদেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিদের বৃহৎ সমাবেশ ঘটে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ডেভিড হেয়ার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৪২] দ্বারকানাথ এই সভায় বলেছিলেন—"এই আবেদন-পত্র সম্পর্কে যে-প্রস্তাব করা হয়েছে তা সমর্থন করতে গিয়ে আমি দশ বছর আগে যা করেছি আজও তাই করছি। সরকার যখন এ রেগুলেশন প্রবর্তন করেন তখন আমি, আমার তিনজন আত্মীয় এবং আমার স্বর্গত বন্ধু রামমোহন রায়—শুধু এই ক'জন এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলাম।* কিন্তু আজ আমি সমগ্র সমাজকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করছি এজন্যে যে, আমি দেখছি এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে সমস্ত টাউন হল আজ য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে।"[৪৩] দ্বারকানাথ উক্ত ভাষণে বলেছিলেন দশ বছর আগে দেশীয় লোকেরা তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কেন এগিয়ে আসে নি, কারণ তাদের ধারণা ছিল—"আমার সাহসের জন্যে পরের দিনই হয়ত আমার ফাঁসি হবে।"[৪৩] প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বেন্টিঙ্কের বিদায় গ্রহণের সমাসন্ন মুহূর্তে সংবাদপত্রের পূর্ব স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার একটা বাতাবরণ সরকারী মহলে সৃষ্টি হয়েছিল—গভর্ণর জেনারেলের পরিষদ সদস্য হিসেবে মেটকাফ ও মেকলে এ বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছিলেন বলে

* পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে উক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দ্বারকানাথ-উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।

অনুমান করা যায়। কারণ, উল্লিখিত আবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৩৫-এর ৬ ফেব্রুয়ারি আবেদনকারীদের জানানো হয়েছিল যে, সংবদাপত্র সম্পর্কে অসুবিধা সৃষ্টিকারী আইন সম্পর্কে সরকার ভাবনা-চিন্তা করছে এবং যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করছে তা হল—"while it gives security to every person engaged in the fair discussion of public measures will effectively secure the Government against sedition and individuals against calumny."[88]

১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড বেন্টিঙ্ক বিদায় নেন এবং অন্তবর্তীকালীন গভর্ণর জেনারেল হন চার্লস মেটকাফ। এপ্রিল মাসেই মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল যে নতুন প্রেস সংক্রান্ত আইনে এদেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। ১৮৩৫-এর ৩ আগস্ট সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল নতুন প্রেস আইন অনুমোদন করেন এবং ঐ বছরেরই ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সেটা বলবৎ হয়। কিন্তু তথ্যে দেখা যায়, উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বেই ১৮৩৫-এর ৮ জুন টাউন হলে এক সভায় কলকাতার অধিবাসীরা মিলিত হয়ে চার্লস মেটকাফকে মানপত্র দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েছিল। তদনুসারে, ১৮৩৫-এর ২০ জুন মেটকাফকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। যে প্রতিনিধি দল এই অভিনন্দন পত্র দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথও ছিলেন। পরে ১৮৩৮ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের স্মরণে মেটকাফের সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল দ্বারকানাথ তদুপলক্ষে এক চিঠিতে (উত্তর ভারতে ভ্রমণরত থাকায়) জানান: একজন জমিদার ও ব্যবসায়ী হিসেবে এদেশের অন্যান্যদের চেয়ে তিনি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে এ সময়ে তাঁর কিছু বলা উচিত, বিশেষত ভারত যখন ইংরেজ জাতি ও ইংলণ্ডের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাদান প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ এই চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, মেটকাফের এই কাজ—"one of the most valuable ever attempted by the Indian Government.

strengthens their own hands and ears, and eyes, in ruling this vast region, and it is also a guarantee to the people that their rulers mean to govern with justice since they are not afraid to let their subjects judge their acts."[৪৬] এই ভোজসভায় দ্বারকানাথ-সুহৃদ মেরিডিথ পার্কার* যে কথা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল যে, "এই নামটি (অর্থাৎ দ্বারকানাথের নাম) ব্যবসায়িক উদারতা এবং বাণিজ্যিক উদ্যম দেখিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য হয়েছেন তাঁদের তালিকায় অগ্রগণ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে চিহ্নিত। তাঁর (দ্বারকানাথের) বিবেচনাপ্রসূত উপদেশ অথবা উদার সাহায্য দ্বারা যারা রক্ষা পেয়েছে বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কাছে আমার বন্ধুর নামটি শ্রদ্ধার বস্তু।" পার্কার দ্বারকানাথ সম্পর্কে এই প্রশংসাসূচক ভাষণে নাটকীয়ভাবে বলেন, (পার্কারের ভাষায়) : It (দ্বারকানাথের নাম) shines gloriously through an act,**—a recent act of charity so princely, so magnificent that I tax my memory in vain to discover a parallel to it within my own knowledge and experience. Above all, the name of this admirable citizen is inseparably connected with that cause whose triumph we have met this night to celebrate. Gentlemen, need I say after this that it is the name of Dwarkanath Tagore."[৪৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবশ্যই নাগরিক স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত। তৎকালে ঔপনিবেশিক শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতীয়দের নাগরিকত্বই স্বীকৃত ছিল না। এরূপ অবস্থায় মেটকাফ প্রবর্তিত

---

* দ্বারকানাথ যখন দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন পার্কার শুল্ক, লবণ ও আফিম বোর্ডের জুনিয়র মেম্বার ছিলেন।

** District Charitable Society-কে এক লক্ষ টাকা দান।

† অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল চার্লস মেটকাফ উক্ত প্রেস আইন প্রবর্তন করে এদেশে কিছুটা সমাদর লাভ করেছিলেন বটে তবে এ কাজের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। যে-কারণে তাঁকে অস্থায়ী গভর্নর-

প্রেস আইনে যে 'স্বাধীনতা' দান করা হয়েছিল, বলা যায়, তার পটভূমি রচিত হয়েছিল ১৮৩২ সালে সংস্কার আইন (Reform Act of 1832)-এর মাধ্যমে বিলাতের বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা। বিলাতের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৮৩৩ সালের সনদের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই উক্ত সনদে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তখন স্বীকৃতিলাভ করেছিল এবং সেজন্য উক্ত সনদকে 'charter of laissez faire' বলা হয়। মেটকাফ-প্রবর্তিত প্রেস আইন এই সনদের পরবর্তী কালের ঘটনা। স্বভাবতই নতুন পরিস্থিতি ভারত সরকার কর্তৃক নতুন আইন প্রবর্তন করার সহায়ক হয়েছিল এবং এর দ্বারা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে উদারপন্থী বলে গণ্য অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদেরই জয় সূচিত হয়েছিল। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত প্রেস আইনে এদেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে যে বৈষম্য দূর করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ-শাসন-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এদেশের ইউরোপীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা নয় বরং ঐ গোষ্ঠীর পরিপোষক এদেশের প্রগতিশীল বলে গণ্য বিত্তবানদের ব্রিটিশ নীতির প্রতি আস্থাভাজন করে তোলা। উক্ত প্রেস আইনে সরকারের কাজের সমালোচনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তার মর্মার্থ ছিল ব্রিটিশ শাসনের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সরকারের ভুল-ত্রুটি

জেনারেল অবস্থায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে তৎকালে কলকাতায় অবস্থানকারী সাংবাদিক (ইংলিশম্যান পত্রিকার) স্টকলার তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন যে—"Sir Charles Metcalf was not confirmed in the office after the departure of Lord William Bentinck. The formal abrogations, by Sir Charles, of the laws governing the press, was an offence of too deep a dye to be readily forgiven by the laudators *temporis acti.*"

(J. H. Stocqueler : Memoirs of a Journalist, London, 1873, pp. 109-10).

ধরিয়ে দেওয়া। সুতরাং সরকার বিরোধী কোন মুদ্রাযন্ত্রের স্থান ছিল না। আর এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্য যে শক্তিশালী রক্ষণশীল (জমিদার ও সমাজ নেতা) পক্ষ ছিল তারাও এদেশের প্রগতিশীল সমাজের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত থাকলেও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিই অনুগত ছিল।

॥ বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিস সংস্কার ॥

১৮৩৬ সালে বিচার ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মফস্বল আদালতে এদেশীয় বিচারকেরা ইউরোপীয়দেরও বিচার করতে পারবে। ফৌজদারি সংক্রান্ত মামলা ভিন্ন ইউরোপীয়রা সোজাসুজি সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারবে না। এই নির্দেশ মেনে নিতে ইংরেজদের জাতিগত মর্যাদায় বাধে এবং তারা উক্ত সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এদেশের ইংরেজ সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট আইনকে 'কালা আইন' (Black Act) বলে আখ্যাত করে। ১৮৩৬ সালের ১৮ জুন কলকাতায় টাউন হলে এ বিষয়ে যে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল তার উদ্যোক্তা ও উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল ইউরোপীয়। ঐ সভায় জনৈক ইংরেজ প্রশ্ন তুলেছিল : "Are the Hindoos now in a fit state to sit in judgment over their conquerers of a different religion ?" [৪৮] কিন্তু সভায় উপস্থিত দ্বারকানাথের মত এদেশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজ জাতি সম্পর্কে ঐরূপ নিন্দা-কটাক্ষের প্রতি কর্ণপাত না করে উক্ত আইন বাতিল করার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তাকেই সমর্থন করেন। উত্থাপিত প্রস্তাবের সারমর্ম ছিল : সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা ব্রিটিশ প্রজাদের অধিকার ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সম্পদের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ নৈপুণ্য এবং মূলধনের বিনিয়োগ ব্যাহত হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে দ্বারকানাথ বলেছিলেন যে, কলকাতার অধিবাসীরা

মফস্বলের লোকদের চেয়ে যে-অগ্রগতি লাভ করেছে তার জন্য তারা ব্যবসায়ী, দালাল ও অপরাপর স্বাধীন ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের কাছে বেশী ঋণী। আলোচ্য আইনের ধারায় যে সমীকরণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে দ্বারকানাথ বলেন: "কিন্তু কার্যত তারা কি ধরনের সমতা এনেছেন। এদেশীয়রা এ পর্যন্ত দাস হয়ে থেকেছে; সেজন্য কি ইংরেজদেরও দাসে পরিণত করতে হবে? সরকার এ জাতীয় সমতাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। এদেশীয়দের যা ছিল সবই তাঁরা নিয়েছেন; তাদের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং সবকিছুই সরকারের দাক্ষিণ্য নির্ভর এবং এখন তাঁরা চাইছেন এদেশের ইংরেজ বাসিন্দাদের সে পর্যায়ে নিয়ে আসতে! তাঁরা এদেশীয়দের ইউরোপীয়দের স্তরে উন্নীত করবেন না, কিন্তু তাঁরা ইউরোপীয়দের মর্যাদা হ্রাস করছেন এদেশীয়দের স্তরে তাঁদের নামিয়ে এনে। (সাধু, সাধু)"।[৪৯] তাঁর এই দীর্ঘ বক্তৃতায় দ্বারকানাথ ইউরোপীয়দের আহ্বান করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে বলেছিলেন এবং ভারতীয়রা এ বিষয়ে এগিয়ে না আসায় দ্বারকানাথ এদেশবাসী সম্পর্কে বলেন যে, "আমাদের দেশবাসীব কাছে বেশি কিছু আশা করা নিরর্থক। তারা অতি ভীরু, এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এগিয়ে আসতে তারা অনিচ্ছুক।···আজকের মত উল্লেখযোগ্য সভায় তাদের এ সংখ্যা-স্বল্পতা দেখে আপনারা বিস্মিত হবেন না। তাদের অনুপস্থিতির কারণ খুঁজে বার করা কষ্টকর নয়। কারণ যে-প্রশ্ন আজ আমাদের আলোচ্য সে প্রশ্নের গুণাগুণ সম্পর্কে তারা অবহিত নয়। কিন্তু এমন সময় আসবে যখন সমস্ত ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে।"[৫০] দ্বারকানাথ অনাগতদিনের জন্য আস্থা স্থাপন করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষাধারার ওপরে। সেজন্য তিনি বলেছিলেন যে, "এখন যে-ভাবে চলেছে সেভাবে হিন্দু কলেজ আরও তিন চার বছর চলতে থাকুক, তখন আপনারা দেখবেন, এ ধরনের সভায় দেশীয় লোকদের উপস্থিতি আরও চারগুণ বেড়ে গেছে।"[৫০] উক্ত ভাষণে

দ্বারকানাথ মফস্বলের বিচার ব্যবস্থার নানা দোষত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথ নিজ অভিতজ্ঞা থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে, "কি সাধারণ খরচের দিক থেকে, কি অন্যায় এবং গোপন খরচের দিক থেকে, অথবা মামলা পরিচালনায় বিলম্বের দিক থেকে—যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন সুপ্রিম কোর্টকে মফস্বল কোর্ট থেকে সব সময়েই অনেক ভাল মনে হবে।"[৫১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, মফস্বলের অধিবাসীদের সুপ্রীম কোর্টে বিচার প্রার্থনা করার সঙ্গতির প্রশ্নটি দ্বারকানাথ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ পূর্বে রামমোহন রায় যে সুপ্রীম কোর্টের বিচার ব্যবস্থায় খরচের মাত্রাকে দূষণীয় বলে উল্লেখ করে হাউস অব কমন্স কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে দ্বারকানাথ সচেতন ছিলেন। সুতরাং বলতেই হয় যে, সুবিচার প্রার্থনায় অপারগ এদেশীয় মফস্বলবাসীদের ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অত্যাচার-প্রবণতা থেকে রক্ষার কোন উপায় দ্বারকানাথ চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বরং বিচার ব্যবস্থায় এই নতুন নীতির সমর্থকদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন: "মারাঠা খালের সীমানার মধ্যে আমি কলকাতায় বাস করছি—যেখানে আমার জীবন সুরক্ষিত (সাধু, সাধু)। মফস্বলে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। সেখানকার হাকিমেরা ইচ্ছা করলে তা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন কিন্তু আমার দেহের তাঁরা কোন ক্ষতি করতে পারেন না। বর্তমান সমস্যাকে উপলক্ষ করে পার্লামেণ্টের কাছে পাঠানো আবেদনকে সমর্থন করা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে কেন অনুচিত তা আমি বুঝতে পারি না।"[৫২] এ সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেকটর্স-এর কাছে প্রেরিত আবেদনে ৫৮২জন ইউরোপীয় স্বাক্ষরকারীদের সঙ্গে এদেশীয় ১১৮জন স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।[৫৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, দ্বারকানাথ পূর্বোক্ত ভাষণে

মফস্বলের বিচারকদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় এবং এদেশীয় লোকদের নিন্দা করায় মেদিনীপুর-হিজলীর জজ অ্যাবারক্রম্বি ডিক পরবর্তী কালে (১৮৩৮) 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের য়ুরোপীয় সমাজকে সমর্থন করতে গিয়ে যে সহৃদয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য এবং উদারতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। তবে কোন প্রমাণ উপস্থিত না করে তিনি তাঁর নিজের দেশবাসীদের যেভাবে নিন্দিত করেছেন—তাকে ঠিক একই ধরনের উদারতার দৃষ্টান্ত বলা যায় কি?"[৫৪] দ্বারকানাথ এই চিঠির উত্তরে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখেছিলেন: "কোন জাতীয় আদর্শ সফল করার জন্যে আমি যখন সচেষ্ট তখন কোন অপ্রীতিকর কাজ করতে আমি দ্বিধা করি না। আমার সামনে সবচেয়ে উঁচু যে আদর্শ রয়েছে তা হল আমার দেশবাসীর নবজন্ম ঘটানো।...এখন মিস্টার ডিক যদি আমাদের দেশবাসীর ত্রুটি কী—তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে বলেন, তাহলে আমার উত্তর হবে: সত্যবাদিতার, ন্যায়পরায়ণতার এবং স্বাধীনচিত্ততার অভাবই তাদের ব্যক্তিত্বের প্রধান দুর্বলতা।"[৫৫] অবশ্য দ্বারকানাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, স্বদেশবাসীর এই সব দোষ-ত্রুটিগুলির উদ্ভব হয়েছে মুসলমান বিজয়ের পর। দ্বারকানাথ উক্ত চিঠিতে বলেছিলেন, মুসলনান শাসন পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিলোপ সাধন, বিজিতরা মুসলমানদের অধীনতায় গ্রহণ করেছিল শঠতা ও বঞ্চনার আশ্রয়। দ্বারকানাথ এও লিখেছিলেন যে, "ইংরেজ বিজয়ের ফলেই প্রথমে একটা পরিবর্তন অনুভূত হল; তবে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সে পরিবর্তনের মাত্রা ছিল খুবই কম। কারণ, ইংরেজরা তাদের আইন, ভাষা, এবং প্রতিষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব আমাদের মধ্যে প্রবর্তন করার বদলে মুসলমান রাজস্ব ও বিচার-পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করছিলেন। বরং তাঁরা এসব পদ্ধতি কিছু কিছু পরিবর্তিত করে

তাকে আরও দূষিত করেছেন। বিচক্ষণ এবং সুফলপ্রসূ একটি নীতি এখন প্রবর্তিত হচ্ছে। যে-শিক্ষা এতদিন উপেক্ষিত ছিল সে আজ অতি দ্রুত তার শক্তিমান প্রভাব বিস্তার করছে; একজন শিক্ষিত ইংরেজ ও একজন শিক্ষিত ভারতীয়ের মধ্যে পার্থক্য এখন মুছে আসছে। তারা ক্রমশ একই সমাজে পরিণত হচ্ছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার দেশবাসীর নিয়োগের ফলে সৎ এবং স্বাধীন-প্রবৃত্তির বিকাশ হচ্ছে।"[৫৬] এই দীর্ঘ চিঠির শেষদিকে দ্বারকানাথ লিখে-ছিলেন: "মিস্টার ডিককে আমি আরও বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে পারতাম, বিশেষ করে উৎকোচ-গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর আমলার কল্পিত সাধুতা* সম্পর্কে আমার অনেক বলার থাকত—যদি-না আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সম্পর্কে কতকগুলো মন্তব্যের মাধ্যমে পুরোপুরি উত্তর দেওয়া হত।"[৫৭] দ্বারকানাথের এই উত্তর প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন: "দ্বারকানাথ প্রকৃত চিকিৎসকের মতই মনে করতেন যে ক্ষত সারিয়ে তোলবার জন্যে প্রথমে তার উৎস-স্থলের অনুসন্ধান কার্যে ব্রতী হওয়াই সর্বোত্তম ও নিরাপদ। ...প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতই তিনি নিজের দেশবাসীর দোষ-ত্রুটি লুকোবার চেষ্টা করতেন না।...এ দোষোদ্‌ঘাটনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দেশবাসীর বিভিন্ন দোষ সংশোধিত করে তাদের চরিত্রের উন্নতি সাধন করা।"[৫৮] কিন্তু, কিশোরীচাঁদ দ্বারকানাথের প্রতি এতখানি সহানুভূতি প্রদর্শন করেও আলোচ্য আইনের বিরোধিতায় ইংরেজ পক্ষ সমর্থনকারী দ্বারকানাথ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এত বিচক্ষণতা সত্ত্বেও যে-বিচারনীতি সম্পর্কে তিনি অভিযোগ এনেছিলেন তার ন্যায়পরতা বা তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন নি। সে নীতি হল প্রতিটি অপরাধীকে আইনের চোখে সমান দেখা, শাস্তিদানের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা,...সাধারণ মফঃস্বল আদালতের আওতা থেকে ইংলণ্ডে জাত প্রজাদের রেহাই

* টীকা 'ট' দ্রষ্টব্য।

দেওয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধ তো বটেই,—এ ছাড়া নীতি হিসেবেও তা অন্যায়, এবং কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় তাতে উৎপীড়নের আশঙ্কা থাকে।"[৫৯] বলা বাহুল্য, উৎপীড়নের ক্ষেত্রে আশঙ্কার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা ইংরেজ কুলোদ্ভব শ্বেত চর্মের লোকদের অত্যাচারে মফস্বল অঞ্চল আতঙ্কিত ছিল। তাদের উৎপীড়নের (জোর করে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী দখল ইত্যাদি) প্রতিবিধান কল্পেই বিচার ব্যবস্থায় উক্ত পরিবর্তন প্রস্তাবিত হয়েছিল। মেকলে, যিনি বিচার-ব্যবস্থায় এই নতুন আইনের রূপকার ছিলেন, ১৮৩৮ সালের ১৭ নভেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় এক চিঠিতে এই আইনের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং উক্ত চিঠিতে এদেশে ইংরেজদের চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে—জালিয়াতি ও নিপীড়নমূলক কাজের জন্য ঘৃণিত, নির্ভয় এইসব ইংরেজরা জানে যে অভিযোগ করলেই তাদের কথা শোনা হবে। মফস্বলবাসী এ জাতীয় ইংরেজদের স্থানীয় আদালতের আওতার বাইরে রাখা এবং নিরীহ অসহায় স্থানীয় লোকদের অত্যাচারী ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হবে। মেকলে চেয়েছিলেন কোম্পানির আদালতগুলিতে যে সকল অন্যায় অনুসৃত হয়, সে সকল অন্যায় উদ্ঘাটনের জন্য স্থানীয় লোকদের ও ইংরেজ বাসিন্দাদের সমস্বার্থের অঙ্গীভূত করতে।* এ জাতীয় অবস্থায় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে স্বদেশবাসী এগিয়ে না আসার জন্য দ্বারকানাথ কর্তৃক নিজ দেশবাসীর নিন্দা করার এবং নিজের ভূমিকাকে স্বদেশবাসীর 'নবজন্ম' ঘটানোর প্রয়াস বলে গণ্য করার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না। দ্বারকানাথের প্রতি অনুরাগ প্রকাশে অকুণ্ঠ অন্য এক দ্বারকানাথ-জীবনী লেখকের মতেও ১৮৩৬ সালের আইনে ইউরোপীয়দের মফস্বল আদালতের অধীন করা শুধু ন্যায্যই ছিল না, "ঐ সঙ্গে উহাদের (ইউরোপীয়দের) ফৌজদারী বিচারের ভারও যদি মফস্বলের ফৌজদারী আদালতের

* টীকা 'ণ' দ্রষ্টব্য।

উপর অর্পিত হইত তাহা হইলে ভবিষ্যতের অনর্থগুলির হয়তো আর সৃষ্টি হইত না।"[৬০] (অনর্থগুলির উল্লেখ অবশ্য সেখানে নেই)। সুতরাং একশ্রেণীর ইংরেজদের তথাকথিত উদারপন্থায় বিশ্বাসী দ্বারকানাথ এই সূত্রে 'দেশবাসীর নবজন্ম' ঘটানোর যে-কথা উচ্চারণ করেছিলেন সেটা তাঁর মনোরাজ্যে তৃপ্তির কারণ হতে পারে কিন্তু বাস্তবে তা ছিল সম্পূর্ণ অর্থহীন। বিচার-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের ভূমিকায় পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীও প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়। তিনি ১৮২৬ সালের জাতি-বৈষম্যমূলক জুরি আইনের প্রতিবাদ করেছেন, আবার ১৮৩৬ সালে বিচার ব্যবস্থায় জাতি-বৈষম্য বিলোপকারী আইনের বিরোধিতা করেছেন। দ্বারকানাথের এরূপ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সত্য অনুভব করা যায় তা হল, যেক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ইংরেজদের বিরোধী হওয়াব প্রশ্ন জড়িত ছিল না (যেমন, জুরি আইন) সেক্ষেত্রে তিনি দেশবাসীর সঙ্গে ছিলেন, আর ১৮৩৬ সালের বিচার-সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে যেহেতু তাঁর সহযোগী ইংরেজরা প্রতিবাদমুখর হয়েছিল সেজন্য তিনি নির্দ্বিধায় ইংরেজদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। এমন কি তথাকথিত 'কালা আইন' বিরুদ্ধ সভায় ইংরেজ কণ্ঠ থেকে স্বদেশবাসীর প্রতি নিন্দাবাক্য উচ্চারিত (পূর্বে উল্লেখিত) হলেও সভায় উপস্থিত দ্বারকানাথ প্রতিবাদ-হীন উদ্দীপনায় ইংরেজ পক্ষকেই সমর্থন করেছিলেন।

ইউরোপীয় ভাবধারা ও ইংরেজ সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বারকানাথের আকর্ষণ তীব্র ছিল বলেই ১৮৩৬ সালে[৬১] ডব্লিউ. ডব্লিউ. বার্ডের নেতৃত্বে গঠিত পুলিস শাসন সংক্রান্ত সংস্কার কমিটির কাছে সাক্ষ্য-দানকালে দ্বারকানাথ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশীয়দের প্রশাসকের পদে নিযুক্তির অনুকূলে যেমন অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তেমনি শিক্ষিত ইংরেজদের নিয়োগের পক্ষেও তিনি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বারকানাথ বলেছিলেন: "অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে দেশীয়, পূর্বভারতীয় বা য়ুরোপীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত

করা উচিত, শেষোক্ত দুই পর্য্যায় থেকে নেওয়া হলে দেশীয় ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক—যাতে দোভাষীর ব্যাখ্যার উপর তাঁদের নির্ভর করতে না হয়।…যে সমস্ত জেলায় য়ুরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, আমার মতে, সে সমস্ত জায়গায় য়ুরোপীয় বেলিফ নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। তবে তারা যেন যথোপযুক্ত শিক্ষিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থেকে তারা দারোগার কর্তব্য সম্পাদন করবে।"[৬২] মনে করা হয় যে, দ্বারকানাথের অভিমত গ্রহণ করে সরকার পরবর্ত কালে এদেশের কতিপয় ইংরাজী-শিক্ষিত যুবককে (এদের মধ্যে হিন্দু স্কুলের উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা ছিলেন) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেছিল। এই সব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীনে মফস্বলের অবস্থা উল্লেখ করে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন: "মহকুমা-শহরগুলো ক্রমশ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল—সকল দিকে স্কুল, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, সাহিত্য-সমিতি প্রভৃতির বিকাশ হল; জনসাধারণের চেতনায় ঝঙ্কৃত হল একটি নবীন এবং সজীব সুরের স্পর্শ।"[৬৩] এদেশীয় প্রশাসকদের কার্যকলাপের উক্ত দৃষ্টান্তসমূহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এর দ্বারা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন-চরিত্রের কিছুমাত্র হেরফের ঘটে নি। কেননা দেখা যায়, ১৮৩৩ সালের আদেশ অনুসারে ১৮৩৭ সাল থেকে এদেশীয়দের ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োগ করা হচ্ছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে এদেশীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষার ওপর নির্ভর করে বাছাই করার যে-পরামর্শ দ্বারকানাথ দিয়েছিলেন তা রক্ষিত হয় নি; বরং থানার দারোগা, পেস্কার প্রভৃতি পদ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত উক্ত পদের মর্যাদারও কোন বৃদ্ধি হয় নি। আর ব্রিটিশ শাসনের মেরুদণ্ড ছিল জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটই ছিল কার্যত সর্বেসর্বা। সুতরাং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে দেশীয়দের নিয়োগের ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নতস্তরে দেশীয়দের কিছু চাকরি

পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু এর দ্বারা শাসনকাঠামোয় এদেশীয় ব্যক্তি বা ভাবধারার কোন সংশ্লেষ ঘটে নি এবং তা ঘটাবার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের তেমন কোন ইচ্ছাও ছিল না। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ১৮৩৩ সালের সনদে (Clause 87) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশীয় প্রজাদের কোম্পানির অধীন সকল শ্রেণীর পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে সনদের ঐ ধারাকে 'wise, benevolent and noble clause' বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে ঐ ধারা-প্রদত্ত অধিকার ছিল মরীচিকা মাত্র। কেননা সনদ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ (Despatch)-এ বলা হয়েছিল যে, সরকারের অধীন চুক্তিবদ্ধ (covenanted) চাকরি এবং অন্যান্য চাকরির মধ্যে চলতি প্রভেদ বজায় থাকবে।* বলা বাহুল্য, ইংরেজ ছাড়া তখন চুক্তিবদ্ধ চাকরিতে এদেশীয়দের কোন স্থান ছিল না। সুতরাং সনদের ধারাটি ছিল মূলত একটি প্রতারণা। সে কারণে এ সম্পর্কে ডিউক অব ওয়েলিংটন মন্তব্য করেছিলেন—"Why was the declaration made in the face of a regulation preventing its being carried into effect? It was a mere deception." এ জাতীয় প্রতারণার দৃষ্টান্তও দ্বারকানাথের

---

* ১৮৩৩ সালের সনদে Clause 87-এ লেখা হয়েছিল : "And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under this said Company". আর সংশ্লিষ্ট Despatch-এ বলা হয়েছিল : "The distinction between situations allotted to the covenanted service and all other situations of an official or public nature will remain generally as at present." (History of Bengal, ed. N. K. Sinha, Ch. Administration 1793-1833,

মতো ব্যক্তিত্বকেও ইংরেজ-সহানুভূতি লাভের মোহ-মুক্ত করতে পারে নি।

॥ ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি / রাজনৈতিক চেতনা ॥

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮২৮-২৯ সাল থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত সরকারী আইনের বিরোধিতায় এদেশের জমিদার শ্রেণী আবেদন-নিবেদন করে আসছিল। এ সম্পর্কে জমিদার শ্রেণীর প্রতিবাদ-চিন্তা ১৮৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে 'রিফর্মার' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ করে 'বঙ্গাদি প্রদেশীয় জমিদারদের এক সমাজ' স্থাপন বিষয়ে এক প্রস্তাব বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৬৫] এর পর ১৮৩৬ সালে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'-র কর্মপন্থায় লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে সরকারী নীতির (কর আরোপ ও পুনর্দখল) বিষয়ে ইতি কর্তব্য বিবেচনা করা হচ্ছিল এবং এ সম্পর্কে উক্ত সভার সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদও ঘটেছিল। ১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাসের এক সংবাদে দেখা যায়, উক্ত সভা আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হিন্দু-মুসলমান সকলকে একত্র করে রাজদ্বারে দরখাস্ত কবার কথা বিবেচনা করেছিল।[৬৬] ঐ বছরেই অক্টোবর মাসের এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে, দেওয়ান রামকমল সেন এক নতুন সমাজ গঠন করে নিষ্কর ভূম্যধিকারীদের পক্ষে এবং রাজকার্যে বাংলাভাষার প্রচলন সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে আবেদন পাঠানোর অভিপ্রায় ব্যাক্ত করেছেন।[৬৭] এই সকল ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে জমিদারদের একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মহলে অনুভূত হচ্ছিল। ১৮৩৭ সালের নভেম্বর মাসের এক সংবাদে দেখা যায়, হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত জমিদারদের সভায় রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে চেম্বার্স অব কমার্সের আদর্শে 'জমিদারদের সমাজ'-এর বিধি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং স্থির করা হয়েছিল যে সমাজের

বিধি বিবেচনার ও সমাজ স্থাপনের জন্য সাধারণ সভা হবে।[৬৮] ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসের সংবাদে দেখা যায় পূর্বোক্ত প্রস্তাব অনুসারে রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে টাউন হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (মার্চ ১৮৩৮) এবং উক্ত সভায় এদেশীয় ও ইউরোপীয়দের নিয়ে বার জন সদস্যের যে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছিল সে কমিটিতে দ্বারকানাথ ছিলেন।[৬৮] 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ডব্লিউ. সি. হারি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই 'ভূম্যধিকার সভা' (Landholder's Society)-র সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন।[৬৯] এই সভার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যে রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সরকার যদিও ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটিকে জমিদারদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বলে বিবেচনা করেছিল তথাপি লাখেরাজ সম্পত্তির বিষয়ে এই সভা বিশেষ ফল লাভ করতে পারে নি। কারণ আইনে শেষ পর্যন্ত মাত্র দশ বিঘা* 'ব্রহ্মত্র' জমি করমুক্ত রাখার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল (সংবাদ প্রভাকর, ২রা মার্চ ১৮৫২)।[৭০] ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ও প্লাণ্টার্স অ্যাসো-সিয়েশন যখন সরকারী রাজস্ব বাকি পড়ার ফলে জমির নীলাম সংক্রান্ত আইনের সংশোধন দাবি করেছিল তখন সরকার সেই দাবির প্রতি কর্ণপাত করে ১৮২১ সালের একটি আইনে বকেয়া রাজস্বের জন্য সুদ ও জরিমানা নেওয়া বন্ধ করেছিল। তবে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, বিভিন্ন সমস্যার** প্রতিবিধান

কল্পে এই সোসাইটি উদ্যোগী হলেও মূলত এই সোসাইটি ভূস্বামীদেরই প্রতিনিধিত্ব করত। যদিও দেশ-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সোসাইটি গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তবু সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল শুধু তাদেরই যাদের জমি সংক্রান্ত স্বার্থ ছিল ("the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country.")[৭১] কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতেও 'এ সংস্থা ছিল মাত্র একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি।'[৭২] এই সোসাইটির অস্তিত্ব (১৮৩৮-১৮৪৪) যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সে সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ বলেছেন: "এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, আরো উদার রাজনৈতিক সংস্থার* অভ্যুদয়ে এ প্রতিষ্ঠান তার গৌরব দীপ্তি হারিয়ে ফেলবে।"[৭২]

তৎকালের সংবাদপত্রেও দেখা যায় যে, ভূম্যধিকারী সভা বা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি-কে রাজনৈতিক সংস্থা বলেই মনে করা হতো। উক্ত সোসাইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের দিনই 'ইংলিশম্যান' (২০ মার্চ ১৮৩৮) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "The Hindoos have at last made the discovery that *Union is power*. This association we look upon as a political association founded on a large and liberal basis ; it admits landholders of all descriptions, Englishman, Musulman, Christians and Hindoos."[৭৩] পক্ষান্তরে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা জমিদারদের এই সভাকে স্বার্থপরদের সভা বলে অভিহিত করেছিল এবং উক্ত সভার প্রতি সরকারের

পাওয়া যায় তার মধ্যে ছিল লাখেরাজ, বিচারালয়ে দেশীয় ভাষা প্রচলন, দেশী-বিদেশী তামাকের শুল্কভেদ, জামিননামার কোর্ট ফীর পরিবর্তন, পিয়াদাদের তলবানা, চৌকীদারদের জন্য কাটিঘর, পুলিশ কর্তব্য না করলে কারাদণ্ড, ফৌজদারী সাক্ষীর খোরাকী ইত্যাদি। (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী,

* প্রথমে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩) এবং পরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১)।

প্রশ্রয়জনক ভূমিকারও সমালোচনা করেছিল। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টারি এজেন্সী স্থাপনের ও লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিল। অনেকের মতে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ছিল প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে 'দ্বারকানাথ ছিলেন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রাণস্বরূপ'।[৭৪] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেছেন, দ্বারকানাথ রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং "It was mainly by his efforts that the 'Landholders' Society' was established in July* 1838."[৭৫] ঐতিহাসিক ড. মজুমদার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটিকে এদেশে স্বাধীনতার অগ্রদূত বলেছেন। ("It may be regarded as the pioneer of freedom in this country.")[৭৬] তখন অবশ্য উল্লেখিত স্বাধীনতাবোধের উৎস ছিল ইংরেজদের সহানুভূতি। এরূপ সহানুভূতির একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্তের কথাই ঐতিহাসিক ড. মজুমদার উল্লেখ করেছেন।** এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্র ছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির সভা (৩০ নভেম্বর ১৮৩৯)। উক্ত সভায় একটি প্রস্তাব প্রসঙ্গে টমাস টার্টন (কলকাতার ব্যারিস্টার, দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠদের একজন এবং পরে স্যার খেতাবপ্রাপ্ত) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: 'বিজিত জাতি হিসেবে তিনি ভারতের অধিবাসীদের ব্রিটিশ-প্রজা রূপে মনে স্থান দিতে ইচ্ছুক নন, বরং ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে সম অনুভূতি, স্বার্থ ও লক্ষ্যের এবং সম-অধিকারের অভিন্ন প্রজারূপে ব্রিটিশ রাজত্বের একটি অংশে সর্বপ্রকারে ভ্রাতৃ-সম্পর্কে স্থিত দেখতে চান। প্রসঙ্গত তিনি সেই রোমান নীতিরও প্রশংসা করেন যে নীতির দ্বারা রোমানরা

---

* মার্চ ১৮৩৮ সালে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়—এ বিষয়ে তথ্যসূত্র পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

** টীকা 'ত' দ্রষ্টব্য।

তাদের বিজয়কে রোমের অঙ্গীভূত করত এবং বিজিতদের রোমান নাগরিকের সুবিধাদি দান করত।' বলা বাহুল্য, টার্টনের এই ভাষণাংশ অনুধাবন করার জন্য যেমন প্রস্তাবের মর্ম উপলব্ধি করা প্রয়োজন তেমনি তাঁর ভাষণের অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশও উল্লেখনীয় বলে মনে হয়। যে প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে টার্টন তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন সে প্রস্তাবটি ছিল—"সমিতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হয়েছে দেখে আনন্দিত। ভারতের উন্নতির জন্যে যাঁরা আগ্রাহান্বিত তাঁদের উচিত এ সমিতির সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা। এ সহযোগিতার উদ্দেশ্য হল গ্রেটব্রিটেনের স্বার্থের সঙ্গে এ দেশের স্বার্থকে একীভূত করা।"[৭৭] সুতরাং প্রস্তাবের মর্মার্থও ইংরেজ সহানুভূতির পরিধি প্রকাশ করে। তা ভিন্ন, ঐ ভাষণেরই ভূমিকাংশে টার্টন বলেছিলেন: "তাঁর এ দেশীয় বন্ধুরা বিশেষ করে এ প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যিনি তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর এ কথা ভাল করেই জানেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না—সে সুদূর কালের কথা চিন্তা করে তিনি স্বরাজ্য শাসন প্রবর্তনের জন্যে তাদের কর্মধারা কি হবে—সে বিষয়ে কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ দিতে চান না। এ রকম কোন ভবিষ্যতের কথা তিনি আদৌ চিন্তা করেন নি। যে কার্যধারা অনুসরণ করলে এ ধরনের পরিণতি ঘটাবার সম্ভাবনা আছে সে ধরনের কাজের কথাও তিনি প্রস্তাব করতে চান না। বরং এ রকম প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করবেন।"[৭৭] ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া-র মতামত উল্লেখ করে টার্টন বলেন—"উপনিবেশকে শাসন করতে হবে সে নীতির সাহায্যে যাতে তার লক্ষ লক্ষ প্রজার উপকার হয়। যদি সরকার এ নীতির অনুবর্তী হন তা হলে সদিচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য শক্তিভিত্তিক সাম্রাজ্যের ওপর জয়ী হবে।"[৭৮] টার্টন উক্ত ভাষণে লর্ড ব্রুহাম প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীর যে অংশের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন তা পাঠ করেন। এবং সেখানে

বলা হয়েছিল—"আমি বিশ্বাস করি কোম্পানীর উদ্দেশ্য সৎ (শুনুন, শুনুন)। আমি বিশ্বাস করি কোম্পানী তার সাধ্যমত ভাল কাজ করছেন। আমি আরও বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের প্রতি কোম্পানীর সৎ কাজের পরিমাণ অপরিমেয়।…এই মুহূর্তে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে—ভারতের অধিবাসীরা কোম্পানী এবং ইংল্যাণ্ডবাসীর নিকট গভীর ঋণে ঋণী (উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি)।"[৭৮] ভারতের উল্লিখিত রাজনৈতিক চেতনার ও সংগঠনিক প্রয়াসের উষালগ্নে উদারপন্থী ইংরেজদের সহযোগিতার (English collaboration-এর) স্বরূপ টার্টনের উপরিউক্ত বক্তব্যে পরিস্ফুট। বাস্তবিক টার্টন-উচ্চারিত বিশ্বাস ও অনুভূতিই যেন দ্বারকানাথেরও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিশারী ছিল। কারণ বিলাত ভ্রমণকালের ঘটবলীতেও যেমন এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তেমনি উল্লেখিত সভায় টার্টনের পরবর্তী বক্তা হিসেবে তিনি ইংরেজ-কাঙ্খিত পথ অনুসরণ করে বলেছিলেন: "এ সমিতির প্রকৃতিতে এমন প্রবণতা নেই যার প্রভাবে শাসনকর্তাদের প্রতি ভারতীয় জনসমাজের প্রীতি কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বরং এ সমিতির সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হল, যে, যে সূত্রের সাহায্যে দুটো দেশের মধ্যে বন্ধন ঘটেছে তাকে দৃঢ় করা। এ ছাড়া পুনর্গ্রহণ কাজের অগ্রগতিতে এবং যে সমস্ত কাজের ফলে ব্রিটিশ অধিকারের জনপ্রিয়তা হারাবার ভয় আছে, তাকে বাধা দেওয়াই সমিতির লক্ষ্য (উচ্চ হর্ষধ্বনি)।"[৭৯] অতএব এ সত্য উদ্ঘাটিত যে, রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে 'এদেশ স্বাধীনতার অগ্রদূত' ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির এদেশীয় নেতৃত্বের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনতিরিক্ত ভাবনা অকল্পনীয় ছিল।

পূর্বে পরিবেশিত তথ্যে দেখা গেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্য কামনায় অকুণ্ঠ দ্বারকানাথ লর্ড বেন্টিঙ্কের বিদায় গ্রহণকালে (১৮৩৫) 'মহামতি শাসনকর্তার প্রতি হৃদয়ের সানুরাগ শ্রদ্ধার্ঘ' নিবেদনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৮০] ১৮৩৮ সালেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহন উপলক্ষ্যে শেরিফ কর্তৃক আহুত

টাউন হলের সভায় ২৯ সেপ্টেম্বর 'মহামান্যা মহারাণীকে তাঁর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে' মাণপত্র দেওয়ার প্রস্তাবের সমর্থনে দণ্ডায়মান দ্বারকানাথ বলেছিলেন: "ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে তাঁর স্বদেশবাসীরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তা তাঁরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন" এবং উক্ত ভাষণে মুসলমান আমলের সমালোচনা করে দ্বারকানাথ একথাও বলেন যে, "দেশবাসীর মনে বর্তমান শাসন সম্পর্কে বহু অভিযোগ আছে, তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীনে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি এখন নিরাপদ"।[৮১] ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে নিরাপত্তা অনুভবকারী দ্বারকানাথ ১৮৪২ সালে প্রথমবার বিলাত ভ্রমণকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ও স্বর্ণপদক লাভ করে সোৎসাহে উত্তর দিয়েছিলেন*: "বিধাতার অভিপ্রায়ে যে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ষার দায়িত্ব এ সরকারের উপর এসে পড়েছে, তাদের কল্যাণ ও প্রগতির জন্যে সরকারের অকৃত্রিম উদার আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ প্রচেষ্টা সমস্ত পৃথিবীর কাছেই প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"[৮২] ঐ বছরেরই জুলাই মাসে লণ্ডনের মেয়র কর্তৃক 'ম্যানসন হাউস'-এ আয়োজিত ভোজসভায় লর্ড মেয়র

* "Dwarkanath lost no time in conveying to 'the Hon. Court of Directors' his effusive thanks for their 'gratifying testimonial', in the course of which he praised 'the just and liberal rule of the Hon. Court', and reitrerated his 'firm conviction that the happiness of India is best secured by her connexion with your own great and glorious country...whose noble solicitude for the welfare and improvement of milllons committed by Providence to its charge, may challange the admiration of the whole world.' "

দ্বারকানাথের স্বাস্থ্য কামনা করে বলেছিলেন: "আমার ডানদিকে যে বন্ধুটি বসে আছেন তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্য এবং মহৎ গুণাবলী তাঁকে সমাজের অলংকারে পরিণত করেছে। ভারতবর্ষে আমার দেশবাসীর প্রতি যে-অসীম দয়া তিনি দেখিয়ে থাকেন তা তাঁকে প্রত্যেকটি ব্রিটিশ প্রজার কৃতজ্ঞতাভাজন করেছে।"[৮৩] ব্রিটিশ আতিথেয়তায় অভিভূত দ্বারকানাথ তাঁর দীর্ঘ প্রত্যুত্তর ভাষণে এই উক্তি করেন যে—এই ইংল্যাণ্ডই ক্লাইভ ও কর্ণওয়ালিশকে পাঠিয়েছিল তাঁদের বাহুবল ও উপদেশের মাধ্যমে ভারতবর্ষের উপকার সাধন করতে। এই ইংল্যাণ্ডই সেই মহান ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল যিনি প্রাচ্যভূমিতে উপযুক্ত ও স্থায়ী শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দেশই মানবমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর (দ্বারকানাথের) দেশবাসীকে মুসলমানদের অত্যাচার ও শঠতা থেকে রক্ষা করেছে, এবং রুশদের ভীতিপ্রদ অত্যাচার থেকেও কম রক্ষা করে নি। (উচ্চ উল্লাসধ্বনি) এবং এ সবকিছু পুরস্কারের আশায় করা হয় নি—প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশায়ও নয়, কল্যাণকর্মের প্রতি ভালবাসায়।... ইংরেজ জাতির প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ তাঁর দেশবাসীর পক্ষে অসম্ভব।[৮৩*] দ্বারকানাথের এ জাতীয় উক্তি লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্তাব্যক্তিদের কাছেও মনে হয়েছিল—'the speech exalted "military exploits over humane statesmanship.'[৮৪] ঐ সোসাইটির কর্তাব্যক্তি জোসেফ পীজকে ১৮৪২-এর ৩১ আগস্ট দ্বারকানাথ তাঁর এই অভিমত সম্পর্কে লিখেছিলেন: "I am glad of the opportunity of expressing to a well-known friend of my country my regret at what appeared to you inaccurate and injurious. My intention was—however imperfectly I was enabled to fulfill it—to state that, all things considered, my nation had been benefited by its deliverance

টীকা 'খ' দ্রষ্টব্য।

from the yoke of the Mahommedans ..."[৮৫] কিন্তু এই উত্তর পীজকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি।[৮৫] শুধু বিলাতের তথাকথিত ভারত-বন্ধুদের মধ্যেই নয় এদেশেও দ্বারকানাথের উক্ত ভাষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বেঙ্গল হরকরা (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রকাশিত হয় (যথা—ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের প্রতি কী প্রশংসাসূচক মন্তব্য ...রুশদের দ্বারা হিন্দুরা কখনও অত্যাচারিত হয়েছে বলে জানা নেই... তবে, দ্বারকানাথ জানতেন রুশদের গালে চড় কষালে 'উচ্চ উল্লাসধ্বনি' লাভ করা যাবে,...ইত্যাদি)।[৮৬] পত্র-পত্রিকাতে বেনামী চিঠিতেও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দ্বারকানাথের উপরি উক্ত প্রশংসা-ভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। একটি চিঠিতে বলা হয়েছিল: "Dwarkanath Tagore betrays the heartless sycophant who has no principles to guide him and who has no honour to call up a blush."[৮৭] এবং অন্য আর এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, দ্বারকানাথের উল্লিখিত মন্তব্যাদি দেশবাসীর প্রতি অসম্মানজনক ও তাদের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকারক।[৮৮] ঠাকুর পরিবারের মধ্যেও বিলাতে দ্বারকানাথের ঐরূপ আচরণের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং সে কারণে দ্বারকানাথকে পারিবারিকভাবে একঘরে করার প্রস্তাব বিবেচিত হয়েছিল বলেও জানা যায়। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত পারিবারিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে দ্বারকানাথের প্রতিকূলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য অনুপস্থিত।[৮৯]

দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাতভ্রমণ-শেষে ভারতে প্রত্যাগমনকালে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন (ডিসেম্বর ১৮৪২) লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির* সঙ্গে যুক্ত বাগ্মী বলে খ্যাত জর্জ টমসনকে। টমসন এর আগে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—সেজন্য টমসনের একটা ভাবমূর্তি ছিল।

* টীকা 'দ' দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, 'দাস' হিসেবে এদেশেরও অসহায় (বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের) লোকদের কলকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশে (মরিসাস, নাটাল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সিংহল প্রভৃতি) কুলিগিরি করার জন্য চালান দেওয়া হতো। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছে। সরকার ১৮৩৭ সালে কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (Acts V ও XXXII of 1837) গ্রহণ করলেও বিশেষ ফল হয় নি। ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসে টাউন হলে কুলিপ্রথা সম্পর্কে এক প্রতিবাদ সভায় দ্বারকানাথ অন্যান্য ইংরেজদের সঙ্গে সরকারের নিকট আবেদন করার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। বোধ হয়, এ কারণে ১৮৩৮ সালের আগস্ট মাসে কুলিপ্রথার দুরবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-তে কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কলকাতার কমিটি (সদস্য ছিলেন টি. ডিকেন্স, জে. পি. গ্রান্ট, ডাউসন, রেভারেণ্ড চার্লস, রসময় দত্ত ও মেজর আর্চার) গঠিত হলে কমিটির নিকট সাক্ষ্যদান-কারীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ও ডেভিড হেয়ার ছিলেন।[৯০] অবশেষে ১৮৩৯ সালে এক আইন দ্বারা যদিও কুলি রপ্তানি বে-আইনী করা হয়, তবু বাস্তবে কুলির চোরাচালান ও তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয় নি।[৯১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ স্কটল্যাণ্ডে থাকাকালীন চার্টিস্ট ও কর্মহীন লোকদের মিছিল প্রত্যক্ষ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এক চিঠিতে লেখেন যে, জর্জ টমসন ভারতীয় কুলিদের দুরবস্থা নিয়ে অনেক কিছু বললেও তিনি বিলাতে অনেক দৈন্য দেখতে পাচ্ছেন—তিন লক্ষের মতো বেকার লোক সৈন্যদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে।[৯২]

টমসনের কলকাতায় আগমনকে উপলক্ষ করে 'Calcutta Star' পত্রিকার সম্পাদক জেমস হিউম দ্বারকানাথের আমন্ত্রণে টমসন এদেশে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কারণ লণ্ডনে মেয়র-প্রদত্ত ভোজসভায় দ্বারকানাথের পূর্বোক্ত ভাষনের পরিপ্রেক্ষিতে

পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ না থাকাই হিউম আশা করেছিলেন। (Mr. Thompson, was Dwarkanath's fellow traveler, he came here at his invitation, he knew what Dwarkanath had said [at Mansion House]. To me it is a little singular that there should have been any simpathy between them.")১৩ বস্তুত হিউমের বিস্ময় প্রকাশের মূলত যে কোন কারণ ছিল না তা অনুধাবন করতে হলে টমসনের এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। টমসন ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতি সমাজের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়েই এদেশে এসেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মনে সেই চেতনা সঞ্চার করা যাতে তাদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। টমসন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন : "It was, to rouse the intelligent natives themselves to a sense of the necessity of becoming the narrators of their own grievances, as far as they suffered under any, that were removable by lagislation. He had no wish to inflame the minds of the multitude, or to spread a spirit of disaffection through their ranks."১৪ অন্য একটি সভায় (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩) টমসন বলেছিলেন : "Let me also frankly avow that I am not the enemy of the East India Company or its Government in this Country. ..."১৪ টমসনের মতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বস্তুত ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্য এক ভাষণে টমসন বলেছিলেন যে, "ইংলণ্ডীয়দিগের হস্তে এতদ্দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজাজ্ঞায় মহাসভা কর্তৃক দত্ত হইয়াছে,··· এদেশের যাবদীয় রাজকর্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামধারি সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে এবং তাহাতে পার্লিয়ামেন্টের পূর্ণ সম্মতি আছে।"১৫ সুতরাং টমসনের এই উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে উদারপন্থী ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্যের নামে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার বিরোধিতা

করলেও রাজনৈতিক দিক থেকে তারা কোম্পানি সরকারের সমর্থকই ছিল—এদেশে ব্রিটিশ শাসনের রজ্জু শিথিল করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বারকানাথের মধ্যে টমসন-ব্যক্ত চিন্তাধারার কোন বিপরীত দৃষ্টান্ত ছিল না বলে দ্বারকানাথের প্রসারিত হাত ধরে এদেশে আসায়, যদিও হিউম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, বাস্তবে টমসনের কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়, বরং সেটা টমসনের পক্ষে একটা সুযোগই ছিল।

যা হোক, দাসপ্রথার বিরোধিতা-খ্যাত জর্জ টমসনের আবির্ভাব তৎকালের কলকাতা সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর বক্তৃতা 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী* তথা শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি তাঁর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটিও লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একটি শাখা এদেশে স্থাপন করায় তৎপর হয়েছিল। সেজন্য দেখা যায়, ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল কলকাতায় যে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে প্রবীণরা কোন অন্তরায় ছিলেন না। টমসনের নেতৃত্বে গঠিত এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন টমসন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সোসাইটি তরুণদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল সত্য কিন্তু সমকালের প্রবীণদের চিন্তাধারা থেকে স্বতন্ত্র কোন রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করতে পারেনি। তৎকালের তরুণদলের রাজনৈতিক চেতনা গঠনের পশ্চাতে দু'জন ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।—ডেভিড হেয়ার এবং জর্জ টমসন। ("David Hare had prepared the soil, on which George Thompson planted the first seed of native political education in our country.")[১৬] প্রতিষ্ঠাকালে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য হিসেবে যে নীতি ঘোষিত হয়েছিল তা হল—"সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মদক্ষতা

* টীকা 'ধ' দ্রষ্টব্য

ও এতদ্দেশে ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ি রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি, ধর্ম, জন্মভূমি, এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।"[৯৭] সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি অবশ্যই জমিদারদের সভা (Landholders' Society) থেকে বিস্তৃত ও উদার ছিল, এবং এই সোসাইটিতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তরুণদের সংশ্লিষ্টতা ও নেতৃত্বও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তৎকালের মধ্যবিত্তদের মুখপাত্রস্বরূপ এই সোসাইটির রামগোপাল ঘোষকেও একথাই বলতে দেখা যায় যে—"he (রামগোপাল) desired nothing more sincerely than the perpetuity of the British sway in this country."[৯৮] সুতরাং নবীনদলের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেহেতু ব্রিটিশ-শাসন-বর্জিত ভারতের স্থান ছিল না সেজন্য তাঁরা টমসনের মাধ্যমে প্রবীণদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের নতুন সাক্ষী হয়েছিল মাত্র। উদারপন্থী বলে চিহ্নিত টমসন প্রবীন ও নবীন দু'পক্ষের নিকটই গ্রহণীয় হয়েছিলেন। দেখা যায়, ১৮৪৩ সালের ১৭ জুলাই ভূম্যধিকারীদের সভায় "দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে জর্জ টমসন বিলাতে তাঁদের (জমিদারদের) এজেন্ট নিযুক্ত হন।"[৯৯]

দ্বারকানাথের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা ছিল মূলত 'স্বাদেশিকতা' বর্জিত— তাঁর কল্পনায় স্বদেশ ছিল ব্রিটিশাধীন ভারত। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন: "রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ একদিকে যেমন ছিলেন রাজভক্ত অপর দিকে তেমনি ছিলেন উদারনৈতিক। তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রধান সূত্র ছিল ভারতের প্রতি সুবিচার কামনা এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য।"[১০০] ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দ্বারকানাথের আনুগত্য যে কত গভীর ছিল সে সম্পর্কে দৃষ্টান্ত হিসেবে দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণকালে (১৮৪৫) আয়ার্ল্যাণ্ডের

স্বদেশপ্রেমিক ড্যানিয়েল ও' কোনেলের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয় উল্লেখনীয়। আলোচনা কালে ও'কোনেল যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে তাঁর দেশের মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন তখন দ্বারকানাথ ও'কোনেল-এর ঐ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে সহমত হতে পারেন নি। উভয়ের মত-পার্থক্যের সূত্রে ব্লেয়ার ক্লিঙ, কিশোরীচাঁদ মিত্রকে অনুসরণ করে, মন্তব্য করেছেন: "They discussed thier common problems as subjects of foreign rule; but, where O'Connell saw the solution as independence, Dwarkanath looked forward to a stronger imperial union based on racial and religious equality."[১০১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায়ও ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রায় অনুরূপ মানসিকতাই ব্যক্ত করেছিলেন। বিলাতে থাকা কালে রামমোহন বলেছিলেন যে, যদি কোন কারণে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ পৃথক হয় তা হলেও তখন ভাষা, ধর্ম ও আচরণের সাদৃশ্যে সংযুক্ত দু'টি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও চরম বাণিজ্যিক সুবিধাজনক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। [" if events should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion, and manners."][১০২] বিদেশী শাসনের স্বরূপ উপলব্ধিতে অপারগ দ্বারকানাথ নিজেকে ব্রিটিশদের সমান প্রজা জ্ঞানে যেন আচ্ছন্ন ছিলেন। তা না হলে ১৮৪২-এ কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে লিখিত চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসাসূচক তাঁর মন্তব্যাদি এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের অভিযোগ খণ্ডনের জন্য দেশবাসীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত* হতে দেখেও তিনি নীরব থেকেছিলেন কেন? এ

* দ্বারকানাথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দু'জন ডিরেক্টরকে সম্বোধন করে যে

প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। তা ছাড়া, ১৮৪৫ সালে বিলাতে গ্ল্যাডস্টোনের** সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যখন তিনি জানতে পারেন যে খ্রীষ্টধর্মানুযায়ী শপথ বাক্য পাঠ করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয় বলে কোন হিন্দু পার্লামেণ্টের সভ্য হতে পারবে না, তখন প্রতিযুক্তি দিয়ে দ্বারকানাথ বলেছিলেন বটে যে পরমেশ্বরে বিশ্বাসী হিন্দুব খ্রীষ্টের দেবত্বে বিশ্বাসীর মতো পার্লামেণ্টের সদস্য হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়েই আলোচনায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।[১০৩] দ্বারকানাথের যুক্তিবাদী মন অসন্তুষ্ট থাকলেও নীরবে চলে আসা ছাড়া এক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের মধ্যে ভিন্ন কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

। শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ।

শিক্ষার প্রতি দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল ছিল তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিফলিত। সমাজে শিক্ষা বিস্তারেও যে তিনি আগ্রহী ছিলেন তার বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। শিক্ষা সম্পর্কে দ্বারকানাথের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের নজিরও রয়েছে—তাঁর স্কুল-শিক্ষক শেরবোর্ণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দ্বারকানাথ তাঁকে মাসহাবা দিয়েছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন—"হিন্দু কলেজের পুনর্গঠনের কাজে

চিঠিটি লিখেছিলেন ডিরেক্টরদেরই একজন J. Lushington দ্বারকানাথের সেই চিঠিকে উল্লেখিতভাবে ব্যবহার করতে যে কুণ্ঠিত হন নি তার উল্লেখ পাওয়া যায় বেঙ্গল হরকরা (১৭ মার্চ ১৮৪৩)-র সম্পাদকীয় মন্তব্যে: "Sir J. Lushington and the Friend of India have quoted this unfortunate letter in reply to every allegation of native grievances, put forth by less contented individuals. We are sorry, therefore, that Dwarkanath ever wrote it, or rather that he ever put his name to it."

** W. E. Gladstone—সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ ও উপনিবেশ সংক্রান্ত সচিব ছিলেন, পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

দ্বারকানাথ ডক্টর এইচ. এইচ. উইলসন এবং ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।"[১০৪] দ্বারকানাথ হিন্দুকলেজের পরিচালক সভার সদস্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি ও কমিটি ফর জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস্ প্রভৃতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। দ্বারকানাথের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ প্রবল থাকলেও দেখা যায় ১৮৩৯ সালে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের জন্য যখন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ একটি 'হিন্দুকলেজ পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন তখন ডেভিড হেয়ার, এডওয়ার্ড রায়ান, মতিলাল শীল, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বারকানাথও উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।[১০৫] অনেকের অনুমান, এই পাঠশালা গঠনের আদর্শেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেছিলেন। দ্বারকানাথ হিন্দু মহিলাদের গোঁড়ামি প্রত্যক্ষ করে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্যে দ্বারকানাথ নিজ ব্যয়ে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনেও উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[১০৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রয়াস সফল হয় নি। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ মহিলা লিখেছিলেন যে দ্বারকানাথ তাঁকে এদেশীয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন: "The day is far distant for this happiness to be conferred on my countrywomen. I would give something to see that man, among the Hindoos, who will have the courage to bring forward his wives and daughters to be instructed upon European principles of education." (Bengal Hurkaru, 8 June 1850). মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে দ্বারকানাথের উল্লেখিত ব্যর্থতাই এ জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করার কারণ।

দ্বারকানাথ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করতেন (যথা—হিন্দু ফ্রী স্কুল, হিন্দু বেনিভোলেণ্ট ইনস্টিটিউশন, ডাফ বিদ্যালয় প্রভৃতি)। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে

দ্বারকানাথ চিকিৎসাবিদ্যার এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীদের শব ব্যবচ্ছেদ বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করাতে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০৭] ক্ষিতীন্দ্রনাথের মতে, দ্বারকানাথের উৎসাহেই মধুসূদন গুপ্ত সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।[১০৭] কিন্তু কৃষ্ণ কৃপালনি বলেছেন, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ব্রাম্‌লির প্রতিবেদনে* ঐ সময়ে শব ব্যবচ্ছেদাগারে দ্বারকানাথের উপস্থিত থাকা বা উৎসাহ দান সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, অথচ শব ব্যবচ্ছেদকালে দ্বারকানাথের উপস্থিত থাকা সম্পর্কে প্রায়শই উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃপালনির মতে, দ্বারকানাথ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখের কারণ এটাই হতে পারে যে প্রথম অবস্থায় যখন অধ্যাপকগণ শব ব্যবচ্ছেদ করতেন তখন দ্বারকানাথ ছাত্রদের পাশে সেখানে উপস্থিত থেকে ব্যবচ্ছেদ প্রত্যক্ষ করতেন।[১০৮] কৃপালনির এই অনুমানের ওপর কোন মন্তব্যের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। দ্বারকানাথ চিকিৎসাবিদ্যা পাঠরত ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধিকল্পে পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের পুরস্কৃত করার জন্য ১৮৪৬ সাল থেকে পর পর তিন বছর দু'হাজার টাকা করে দান করেছিলেন।[১০৯] এ বিষয়ে ১৮৩৬ সালের ২৭ মার্চ দ্বারকানাথ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার অধ্যাপক ব্রাম্‌লিকে একটি পত্রদ্বারা জানান—"মেডিকেল কলেজে আপনি যে সমস্ত কাজ শুরু করেছেন

* Prof. Bramley's report of the first performance of dissection : "On the 28th October four of the most intelligent and respectable pupils, at their own solicitation, undertook the dissection of the human subject and in the presence of all the professors of the college and of fourteen of their brother pupils demonstrated with accurancy and nicety several of the most interesting parts of the body."

সেগুলো সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে অনিচ্ছুক। কারণ্ শুধু কথার দ্বারা যে অনুভূতি প্রকাশ করা যায়, মেডিকেল কলেজের প্রতি আমার অন্তরানুভূতি তার চাইতে অনেক গভীর।

"...আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে এ কথা বলতে পারি, আমার দেশবাসীকে কর্মে-প্রবৃত্ত করানোর পক্ষে আর্থিক পুরস্কারের তুল্য কোন প্রেরণা নেই...।

"অতএব বর্তমানে যে সমস্ত ছাত্র কলেজে পড়ছে কিংবা ভবিষ্যতে যে সমস্ত ছাত্র পড়বে তাদের উৎসাহিত করতে আমি আগামী তিন বৎসরের জন্যে বার্ষিক দু হাজার টাকা হিসেবে দিতে চাই। পুরস্কারের আকারে এ টাকা ছাত্রদের মধ্যে বিতরিত হবে।...পুরস্কার বিতরণ সম্পর্কে অপরাপর ব্যবস্থা করাব দায়িত্ব আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম।"[১১০] জেনাবেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস্-এর সেক্রেটারি দ্বারকানাথের এই দান গ্রহণ করে দ্বারকানাথকে প্রশংসা-সূচক পত্রও দিয়েছিলেন।[১১০] দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার (১৮৪৫) বিলাত যাত্রার সময় ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দু'জন ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কর্তৃপক্ষ তা অনু-মোদন করেন এবং শেষ পর্যন্ত আরও দু'জন ছাত্রের খরচের ব্যবস্থা হওয়ায় মোট চারজন ছাত্র (ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার চক্রবর্তী ও দ্বারকানাথ বসু) শিক্ষক হেনরি গুডিভ সহ দ্বারকানাথের সঙ্গে বিলাত গমন করেছিলেন। দেশীয় লোকেরা যাতে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য পটল-ডাঙায় Native Fever Hospital স্থাপনের উদ্যোগপর্বে দ্বারকানাথ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক সহায়তা দান করেছিলেন; যদিও এই হাস-পাতালের প্রতিষ্ঠা সময়ে (১৮৪৮) তিনি জীবিত ছিলেন না। পরে এই হাসপাতালই কলকাতা মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে শিক্ষা বিস্তারে

দ্বারকানাথের যথেষ্ট আগ্রহ এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষা-পদ্ধতি নির্বাচনে তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা-জগৎ যেন ইংরেজ শাসনের কল্যাণ কামনায়ই আশ্রিত ছিল। এই মন্তব্য করার কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে লর্ড ব্রুহামকে লিখিত তাঁর একটি চিঠি (এপ্রিল ১৮৪৩)। উক্ত চিঠিতে দ্বারকানাথ লিখেছিলেন যে, বেণ্টিঙ্ক ও অকল্যাণ্ড ইংরেজী-শিক্ষার প্রতি যে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তার ফলে বঙ্গদেশের স্কুলগুলি ইতোমধ্যেই কোম্পানি সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মে কিছু সুদক্ষ অধস্তন কর্মচারী প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এরূপ অধস্তন পদগুলিতে সরকারের উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য যাতে উত্তম লোক নিয়োগ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। দ্বারকানাথের এরূপ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল লর্ড এলেনবরোর আমলে যাতে চলতি শিক্ষা-নীতির পরিবর্তন না ঘটে সেজন্য ব্রুহামের সহায়তা প্রার্থনা করা। (ব্লেয়ার ক্লিঙ এই চিঠি মূল সূত্র থেকে উদ্ধৃত করে চিঠিটিকে তাঁর গ্রন্থে এভাবে পরিবেশন করেছেন—'He wrote the "Great School-master" (ব্রুহাম) asking him to press Lord Ellenborough to cooperate more fully with the Bengal Council of Education. Dwarkanath pointed out that as a result of the support given English education by Bentinck and Auckland the schools of Bengal had already "sent into the company's service some of the most efficient subordinate agents in the administration of the civil affairs of the country, and it is to the subordinate service that we must cotinue to look for the very best instru-ments the government can employ to carry its purposes."[১১১] (ব্রুহামের কথায় অবশ্য এলেনবরো কর্ণপাত করেন নি।) দ্বারকানাথের এই চিঠি সম্পর্কে বলা হয় যে, শিক্ষিত তরুণদের প্রতি সহানুভূতিশীল দ্বারকানাথ তাদের চাকরির পথ উন্মুক্ত করায় আগ্রহী ছিলেন।[১১২] কিন্তু দ্বারকানাথের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

বা তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান, যে দৃষ্টিতেই উক্ত চিঠির ব্যাখ্যা করা হোক না কেন চিঠিতে এ সত্য উদ্ঘাটিত যে দ্বারকানাথ ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থকে শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত করে দেখেছেন। অর্থাৎ তৎকালে দেশের ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি কোম্পানি সরকারের 'সুদক্ষ কর্মচারী' সৃষ্টির ক্ষেত্র হবে এরূপ সম্ভাবনার যুক্তি দেখিয়েই দ্বারকানাথ পাশ্চাত্ত্যাভিমুখী শিক্ষাব্যবস্থাকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী-শিক্ষা প্রসারে মেকলে-সৃষ্ট নীতির ফলে পরবর্তী কালে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে কেরানি তৈরি হয়েছিল বলে সে-নীতি ইতিহাসে চিহ্নিত। দ্বারকানাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের 'সেবক' সৃষ্টির প্রবণতা, স্বদেশ-ভাবনার কথা ছেড়ে দিলেও, তাঁর মতো উদ্যোগপ্রবণ চরিত্রের পক্ষে বেমানান।

সমাজের সাধারণ ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৮৩৫ সালে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। (পরে এই সংস্থাই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয় এবং ভারত স্বাধীন হলে জাতীয় গ্রন্থাগার বা National Library-তে রূপান্তরিত হয়)। 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এর ইতিহাসে লেখা হয়েছে যে— "Prince Dwarkanath became the first proprietor of the Calcutta Public Library."*[১১২] কিন্তু, তৎকালের সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৫ সালে উক্ত লাইব্রেরীর উদ্যোক্তাদের সকলেই ছিলেন ইউরোপীয় এবং প্রথমদিকে কর্তৃপক্ষ-সদস্যবাও ছিলেন সকলেই ইংরেজ।[১১৩] এই লাইব্রেরীর প্রথম সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন স্টক্‌লার। জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসে উল্লেখিত তথ্য অনুধাবনের সুবিধার্থে

---

* 'proprietor' শব্দটি বর্তমানকালে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে, মনে হয়, তৎকালে পরিচালক সভার সদস্যদের directors বা proprietors বলে হয়ত উল্লেখ করা হতো বা সাহায্যকারীদের proprietors বলা হতো।

এ বিষয়ে স্টক্লারের নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃত করা হল। স্টক্লার লিখছেন: "Finding, by my letter from Bombay, that the 'general library' had taken firm root and was flourishing, I determined to attempt the introduction of a similar establishment in Calcutta, for that city was equally destitute of a *public* library. The endeavour had been made some years previously and had failed.

"Receiving a good deal of countenance from the upper classes, my project was now submitted to a public meeting, over which Sir John Peter Grant, one of the judges of the supreme court, presided, and was so well received that subscriptions rapidly poured in, and books were presented. I was appointed honorary secretary to the library, and received very gratifying public tributes to my humble endeavours to supply a real want."[১১৪] কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্ভব পর্বে দ্বারকানাথের নামোল্লেখ না থাকলেও মনে হয় দ্বারকানাথ এই লাইব্রেরী গঠনে অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং পরে আরও বেশী উৎসাহ নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন বলেই হয়ত এই লাইব্রেরীর ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেছে। কলকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল ইংরেজ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই। ১৮৩০ সালের (৪ ফেব্রুয়ারি) এক সংবাদ থেকে জানা যায় কলকাতার বিশপের বাড়ীতে এরূপ একটি সোসাইটি স্থাপন সম্পর্কে সভা হয়েছিল। তারপরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি স্থাপন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোসাইটির কাজকর্ম (দুঃস্থ-দরিদ্রদের সেবা) পরিচালনার ক্ষেত্রে তখনও কোন এদেশীয় ব্যক্তির উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১১৫] ১৮৩৩ সাল থেকে এদেশীয় ধনী ব্যক্তিরা এই সোসাইটির কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অনেকেই নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন বলে জানা যায়। কলকাতাকে বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত করে সোসাইটি

কমিটি নিযুক্ত করেছিল— পল্লীর অবস্থা অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার নিমিত্ত। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাড়াও সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা এই সোসাইটির কমিটিতে যুক্ত ছিলেন।[১১৬] ১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সোসাইটিকে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ'-এ (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮) লেখা হয় যে— "ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসাইটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। এই টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ডনামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।"[১১৭] দ্বারকানাথ ঠাকুর এই বিপুল অর্থ দান করায় স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে তাঁর প্রশংসা-সূচক মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমকালীন 'চন্দ্রিকা' পত্রিকায় এ সম্পর্কে কিছু সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল, যথা—"অন্ধ আতুর সহায়হীন দীন দুঃখীদিগের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র তাঁহার বিষয় নির্ব্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাঁহারা দিবেন কিন্তু কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা খোঁড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার নিশ্চয় নাই।"[১১৮] তৎকালে সামাজিক ব্যাপারে বা গরীব-দুঃখীদেব জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অনেক সময়েই ব্যক্তিগতভাবে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে থাকতেন। সে কারণে উক্ত সমালোচক লিখেছিলেন যে, "ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখা উচিত ছিল না।[১১৮] ১৮৩৫ সালে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির প্রস্তাবে যাতে এদেশীয় লোকেরা উৎসাহী হয় সেজন্য

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রসময় দত্ত চিকিৎসালয়ের কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।[১১৯] লটারী কমিটি কলকাতায় পুকুর খনন কার্যের জন্য যে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন (১৮৩৩) করেছিল দ্বারকানাথ তারও সদস্য ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি যখন 'ভবঘুরে আইন' প্রবর্তন করে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং দারিদ্র্যাবাস স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল তখন দ্বারকানাথ সর্বাগ্রে তা সমর্থন করেছিলেন—দ্বারকানাথ খয়রাতি সাহায্যকে দেশীয় সমাজের অনগ্রসরতা মনে করতেন। কিন্তু দ্বারকানাথ যখন 'ভবঘুরে আইন' প্রবর্তনের অনুকূলে তাঁর মনোভাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, "য়ুরোপীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের চাইতে দেশীয় অধিবাসীদের অঞ্চলে ভিক্ষুকের উপদ্রবের আধিক্য"[১২০] তখন এদেশীয় সমাজনেতার কণ্ঠে নিজ দেশের সামাজিক অবস্থার সম্যক উপলব্ধির অভাবই প্রকটিত হয়। অবশ্য পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি দ্বারকানাথের সহমর্মিতা থাকায় তিনি সরকারের আনুকূল্যজাত বা ইউরোপীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যুক্ত থাকায় যে বেশী আগ্রহী ছিলেন তা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও আর্থিক সহায়তাদানে দ্বারকানাথের বদান্যতার আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে, যথা—১৮৩১ সালে কটকের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করা এবং ১৮৩৮ সালে ভারতের পশ্চিমাংশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে পাঁচশত টাকা দান ইত্যাদি।[১২১] তা ছাড়া পূজাপার্বনের ক্ষেত্রে ও ব্রাহ্মণদের দান করার ব্যাপারে তিনি উদার হস্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত ঘটনাবলী থেকে একথা স্পষ্ট যে, দ্বারকানাথ আপন বৈশিষ্ট্যে নানাবিধ সামাজিক কল্যাণ কর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করায় কুণ্ঠিত ছিলেন না। বোধ হয় সে কারণেই দ্বারকানাথের কাজ-কর্মের সমালোচক বলে চিহ্নিত ব্যাপটিস্ট মিশনের সাপ্তাহিক পত্রিকা Friend of India (6 January 1842) দ্বারকানাথের দান প্রবণতা নিয়ে লিখেছিল :
"To describe Dwarkanath Tagore's public charities would be to enumerate every charitable institution in Calcutta. ...Nor must we forget that he has taken the lead in every institution—

those of Christian Mission perhaps excepted—which has been established with a view to the improvement of the country ;...''[১২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ সেণ্ট টমাস গীর্জার জন্য একটি ঘড়ি দান করেছিলেন।[১২৩]

দ্বারকানাথের সময়ে কলকাতায় নাট্যামোদীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশীয়ভাবে গঠিত নাট্যশালাও যে ছিল না তা নয় (যেমন, হিন্দু নাট্যশালা)। তবে দ্বারকানাথ ইউরোপীয় সমাজের সাহচর্যকেই যেহেতু পছন্দ করতেন এবং তাদের নাট্যপ্রীতিকে সমাদর করতেন সেহেতু দেখা যায় তিনি 'চৌরঙ্গী নাট্যশালা'-র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৩৫ সালে (২০ নভেম্বর) জে. ক্যামেরনকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায় যে কলকাতার নাট্যশালায় নৃত্য-গীতে অংশ গ্রহণকারী অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। (চিঠির অংশ : "The Misses Nicholson generally favour me with their company. The two eldest are learning to sing under Pizonni* and are improving very much in vocal powers. ...The late arrivals have imported some new beauties from England, and among them Mrs Shaw, a widow of a Captain, has brought out her twin daughters, these young creatures are accompolished in every thing. ...They are recommended to our attention by your corresponding House in England and I as their agent, am in duty bound to take care of them. ...''[১২৪]) দ্বারকানাথের নাট্যপ্রীতি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে—"Under Parker's** influence Dwarkanath became the major patron of the Chowringhee Theater and developed a

* Pizzoni ইটালিয়ান অপেরা কোম্পানির গায়ক ছিল; আর দ্বারকানাথ কলকাতায় নৃত্যগীত পরিবেশনকারী এই কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

** H. M, Parker—লবণ, শুল্ক বোর্ডের সদস্য, অভিনয় ও নৃত্যগীতে পারদর্শী পার্কার দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গদের একজন ছিলেন।

life-long interest in European music, opera, and drama. Thus, on the threshold of his most important entreprencural undertaking, Dwarkanath projected not so much the image of speculator, moneylender, and rent-collector as that of renaissance prince."[১২৫] ১৮৩৯ সালের* মধ্যে দ্বারকানাথ চৌরঙ্গী নাট্যশালা কিনে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে 'সমাচার দর্পন'-এ লেখা হয়েছিল (১৫ই জুন ১৮৩৯): "সম্প্রতি যে ভূমিতে [চৌরঙ্গীস্থ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঐ ভূমিতে বৃহৎ দুই বাটী নির্ম্মানার্থ স্থির করিয়াছেন।"[১২৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ কেনার আগে নাট্যশালাটি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল বলেই ভূমির কথা সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত দ্বারকানাথ শুধু এদেশীয় রাজা-মহারাজা নয় ইউরোপীয় উচ্চ মহলের সমকক্ষরূপে নিজেকে প্রতিভাত করায় যে উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। যথা:—গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৭ সালে ঘোড়-দৌড় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার জন্য Auckland Cup দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বারকানাথও সেই উপলক্ষে একটি Tagore Cup তৈরি করান। পারিতোষিক হিসেবে নির্দিষ্ট এই বস্তু দু'টিকে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সান্ধ্য-ভোজ-সভায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বারকানাথের ব্যয়ে হাজার ভরি ওজনের রূপার 'কাপ'-টি হ্যামিল্টন কোম্পানি তৈরি করেছিল। সংবাদপত্রে এই 'কাপ'-টি সুদৃশ্য ছিল বলে প্রশংসিতও হয়েছিল।[১২৭] এই 'কাপ'-টি সম্পর্কে ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে (১৬ জানুয়ারি ১৮৩৭) লিখেছেন: "A cup of silver, given by a rich Bengalee Dwarkanath Tagore, was run for: the cup was elaborately

---

* হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের (Indian Stage) সূত্রে কৃষ্ণ কৃপালনি লিখেছেন, ১৫ আগস্ট ১৮৩৫ সালে ঐ নাট্যশালা দ্বারকানাথ ক্রয় করেছিলেন।

worked, and the workmanship good ; but the design was in the excess of bad taste, and such as only a Baboo would have approved."[১২৮] আর দ্বারকানাথের বিলাস-ব্যসনের অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল ছিল বেলগাছিয়া ভিলা। নৃত্যগীত, আমোদ-স্ফূর্তির সঙ্গে রাজকীয় খানাপিনার মনোরম সমাবেশ ঘটত দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলায়। এই ভিলার আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমকের বর্ণনা কিশোরীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। ঝিল, ফুলের বাগান, ফোয়ারা ও নানা উৎকৃষ্ট চিত্র-ভাস্কর্যে শোভিত ভিলাটির আকর্ষণ ছিল দুর্বার। কিশোরীচাঁদের মতে, "বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল সেযুগের একমাত্র বাগান-বাড়ি বা একমাত্র স্থান যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা মিলিত হতেন, মেলামেশা করতেন স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতায়।"[১২৯] এই ভিলায় আপ্যায়িতদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের জজ, কাউন্সিল সদস্য, সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার প্রভৃতিদের সঙ্গে জমিদার ও হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীবাবুরাও থাকতেন। এই ভিলায় অনুষ্ঠিত বাই নাচ সহ নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও খানাপিনার বিবরণ সমকালীন সংবাদপত্রেও প্রকাশ[১৩০] পেত এবং সে বিষয়ে রসাল ও ব্যঙ্গাত্মক* রচনাদিরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর আত্মজীবনীতে একদিনের সমারোহ সম্পর্কে লিখেছেন: "যখন এখানে গবর্ণর জেনারল লর্ড অকলণ্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়া বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।"[১৩১] এই সমারোহে গভর্নর-জেনারেল যেভাবে অনুচরবৃন্দ

---

* ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ার একটি দৃষ্টান্ত:

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।"

সহ এসেছিলেন সে-দৃশ্য দেখে অকল্যাণ্ড-ভগিনী এমিলি ইডেনের মনে হয়েছিল যেন এক মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া হচ্ছে। এবং ইডেনের মতে, দ্বারকানাথ "is the only man in the country who gives pleasant parties."১৩২ দ্বারকানাথ বিদেশী অভ্যাগত-দের (যেমন, হল্যাণ্ডের ও রুশ দেশের রাজপুত্র) জন্য হাতীতে চড়ে অভিযান, আতস বাজী, নাচ-গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন।১৩৩ দ্বারকানাথ ইউরোপীয়দের জন্য অনুষ্ঠিত সমারোহের কয়েকদিনের মধ্যেই আবার দেশীয়দের জন্য আলাদাভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন।১৩৪ ইউরোপীয়দের নিয়ে সমারোহ করা সম্পর্কে ব্লেয়ার ক্লিঙ মন্তব্য করেছেন যে—"As self-appointed local potentate, Dwarkanath felt obligated to entertain important foreign visitors to his city."১৩৫ কিন্তু দ্বারকানাথকে শেষ পর্যন্ত প্রভুত্বগর্বী ইংরেজরা, বোধ হয়, ঔপনিবেশিক প্রজার এক আলোকপ্রাপ্ত ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব ভিন্ন অন্যভাবে গ্রহণ করে নি। দ্বারকানাথ নিজেও, অনুমান হয়, একসময়ে এই অনুভূতি লাভ করেছিলেন যে শাসকপ্রভুরা বস্তুত ভারতীয়দের প্রতি সমদৃষ্টি পোষণ করতে পারে না। দ্বারকানাথের এরূপ অনুভূতির উৎস রাজকীয় খেতাব লাভের ব্যর্থতাই হোক বা ইংরেজদের খানাপিনা দিয়ে ক্লান্ত দ্বারকানাথের বিরূপ অভিজ্ঞতাই হোক তাঁর মধ্যে এ জাতীয় অনুভূতির ইঙ্গিত বহন করে পুত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর একটি নির্দেশ—'ইংরেজকে যেন খানা দেওয়া না হয়'।* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ পুত্রকে এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকলেও তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যে ইংরেজ বা ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করেন নি তার প্রমাণ রয়েছে বিলাত পরিক্রমা কালে তাঁর ভূমিকায়।

* দেবেন্দ্রনাথের প্রতি দ্বারকানাথের ঐ নির্দেশের সূত্র হল রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-র 'স্বাদেশিকতা' অংশের প্রথম পাণ্ডুলিপি। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'Memoir of Dwarkanath Tagore'-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাংশে কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ঐ সূত্র নির্দেশ করে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

সূত্রসূচি

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন,
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী,
বিনয় ঘোষ : বাংলার বিদ্বৎসমাজ,
Collet, S. D. : The life and Letters of Raja Rammohun Roy, ed. Biswas and Ganguli,
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (১ম খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৭৭, পৃ ৮-১২, ৩৬১; এবং A. F. Salahuddin Ahmed : Social Ideas and Social Change in Bengal,
Poddar, Arabinda : Renaissance in Bengal (Quests and Confrontations 1800-1860),
ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৬৬।
,, ৬৭।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,

কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর, (বঙ্গানুবাদ), সম্পাদনা—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, ১৯৬২, পৃ ২৬৩ (প্রসঙ্গকথা)।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৭৪-৭৫।
,, ৯৯।
The Days of John Company (Selections from Calcutta Gazette) 1824-1832, ed. A. C. Das Gupta, 1959, pp. 473-75.
কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৩৪।
ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৯০-৯১।
সৌম্যেন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৬ ; স. সে. ক., (১ম খণ্ড), পৃ ১৬১-৬৩।
Kripalani, Krishna : Dwarkanath Tagore, 1981, p. 49.
The Days of John Company, p. 509.
The Bengal Hurkaru, 16 December 1829 ; vide Ahmed : op. cit., p. 10.
Ahmed : op. cit., p. 72.

২১. The Calcutta Journal, 2 June 1834—Quoted in 'History of Bengal', ed. N. K. Sinha,

২২. Ahmed : op. cit., p. 147.

২৩. Ibid, p. 148.

২৪. স. সে. ক., (২য় খণ্ড), পৃ ৩৭০-৭১।

২৫. Ahmed : op. cit., p. 120.

২৬. Ibid, p. 120 f. n. 6.

২৭. English Works of Raja Rammohun Roy, ed. Nag and Burman, Pt. IV, pp. 26-27—Quoted by Kling, op. cit., pp. 25-26.

২৮. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৭০।

২৯. Kripalani : op. cit., pp. 56-57.

৩০. Ibid; p. 56.

৩১. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৫২,৮৯।

৩২. স. সে. ক., (২য় খণ্ড), পৃ ৪৯০-৯৪।

৩৩ Kripalani : op. cit., pp. 57-58.

৩৪. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ৬৮-৬৯।

৩৫. Kripalani, op. cit., p. 58.

৩৬. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ৪৬।

৩৭. ঐ, পৃ ৪৬-৪৭, ২৯৬ (প্রসঙ্গকথা) ;
স. সে. ক., (২য় খণ্ড), পৃ ১৮৯-১৯১, ২৬৯-৭০।

৩৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক-পত্র (১ম খণ্ড)

৩৯. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ১৯৭-৯৮, ২০০।

৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ : ঐ, পৃ ১৯ ; এবং Kopf, David : British Orientalism & the Bengal Renaissance,

৪১. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৪৮ ।

৪২. Ahmed : op. cit., pp. 85-86.

৪৩. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৫২।

৪৪. Ahmed : op. cit , p. 86.

৪৫. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৫৩-৫৪।

৪৬. Mittra, Kissory Chand . Memoir of Dwarkanath Tagore, 1870, p. 47 ; ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ২০৪ ।
৪৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ ২০৫ ।
৪৮. Kling : op. cit., p. 163.
৪৯. Mittra, K. C. : op. cit., p. 54.
৫০. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৬২ ।
৫১. ,, ৬৪-৬৫ ।
৫২. ,, ৬৫ ।
৫৩. Kling : op. cit., p. 163.
৫৪. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৬৮ ।
৫৫. ,, ৬৯ ।
৫৬. ,, ৬৯-৭০ ।
৫৭. ,, ৭০-৭১ ।
৫৮. ,, ৭১ ।
৫৯. ,, ৬৬-৬৭ ।
৬০. যোগেশচন্দ্র বাগল, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃ ১২-১৩ ।
৬১. History of Bengal, ed. N.K. Sinha,
৬২. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৭৪-৭৫ ।
৬৩. ,, ৭৫ ।
৬৪. History of Bengal,
৬৫. স. সে. ক., (২য় খণ্ড), পৃ ১৫৭ ।
৬৬. ,, ৩৯৮-৪০৫ ।
৬৭. ,, ৪০৫ ।
৬৮. ,, ৪০৫-৮ ।
৬৯. কিশোরীচাঁদ ঐ, পৃ ৩৪ ।
৭০. স. সে. ক., (২য় খণ্ড), পৃ ৭৫২ ।
৭১. History of Bengal, ed, N.K. Sinha,
৭২. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৩৯ ।
৭৩. Kripalani, op. cit., p. 119.
৭৪. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ৩৫ ।
৭৫. Majumdar, R. C. : Histroy of the Freedom Movement in India, Vol. I, -

৭৬. Ibid.

৭৭. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ১৮০ (পরিশিষ্ট)।

৭৮. „ ১৮২ (পরিশিষ্ট)।

৭৯. „ ১৮৫ (পরিশিষ্ট)।

৮০. „ ৪০।

৮১. „ ৭১-৭২।

৮২. „ ১২১।

৮৩. ঐ, পৃ ১০৮ এবং Kripalani op. : cit., p. 162. ; Also Kling : op. cit., p. 170.

৮৪. Kling : op. cit., p. 170.

৮৫. Kripalani : op. cit., pp. 162-63.

৮৬. Ibid, pp. 163-64.

৮৭. The Bengal Hurkaru, 28 Sept. 1842 (Kling . op. cit., pp. 179-80).

৮৮. Ibid, 21 March 1843 (Kling : op. cit., p. 181).

৮৯. Kripalani : op. cit., pp. 185-86.

৯০. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য় খণ্ড), সম্পাদক বিনয় ঘোষ, ১৯৬৪, পৃ ৫৯৯-৬০০।

৯১. ঐ, ১৬১-৬৩।

৯২. Kling : op. cit., p. 172.

৯৩. Ibid, p. 176 (Vide Letters to Friends at Home bv an Idler from June 1842 to May 1843, pp. 80-81).

৯৪. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ঐ, পৃ ৬০৩।

৯৫. ঐ, ২৪৯।

৯৬. Chandra, Bholanath : Life of Raja Digambar Mitra, p.34. কিশোরীচাঁদ : ঐ, ২৯৫-৯৬ (প্রসঙ্গকথা)

৯৭. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ঐ, পৃ ১৭৮।

৯৮. ঐ, পৃ ৬০৬।

৯৯. যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৫২, পৃ ৫২।

১০০ কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১৪১।

১০১ Kling : op. cit., p. 233. Mittra, K.C. : Memoir of Dwarkanath Tagore, 1870, pp. 115-16.

১০২. Collet : op. cit., Ch. Emassy to Europe, p. 338.

১০৩. কিশোরীচাঁদ, পৃ ১৩৩-৩৪।

১০৪. ,, ২৮।

১০৫, স. সে. ক. (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ২৭।

১০৬. কিশোরীচাঁদ, ঐ, পৃ ১২৩ ; Kripalani : op. cit., p. 110.

১০৭. ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঐ, ১৬৮।

১০৮. Kripalani : op. cit., p. 134 (Note 31).

১০৯. স. সে. ক. (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৩৭-৩৯।

১১০. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ৩০-৩২।

১১১. Kling : op. cit., p. 179.

১১২. India's National Library, ed. B.S. Kesavan, 1961, p. 2.

১১৩. স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ১১৭-১৯।

১১৪. Stocqueler, J. H. : The Memoirs of a Journalist, 1873, p. 107.

১১৫. The Days of John Company, pp. 481-82.

১১৬ স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ৩০০-৩০৪।

১১৭. ,, ৩০৮-৯।

১১৮. ,, ৩২০।

১১৯. ,, ৩১৫।

১২০. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ৫৬-৫৭।

১২১. স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ২৯৩, ৩১৯।

১২২. Kripalani : op. cit., pp. 139-40.

১২৩. কিশোরী চাঁদ : ঐ, পৃ ৮০।

১২৪. Kripalani : op. cit., pp. 94-95 ; Kling : op. cit., p. 160.

১২৫. Kling, op. cit., p. 49.

১২৬. স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ৪৫০।

১২৭. ,, ৪৪৮।

১২৮. Parks, Fanny : Wanderings of a Pilgrim in Search of a

১২৯. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ৮৩।

১৩০. স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ৪৪৭-৪৮, ৪৫০।

১৩১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত,

১৩২. Eden, Emily : Letters from India, Vol. I., 1872, pp. 215-16, 234-35.

১৩৩. Kling, op. cit., p. 159,

১৩৪. স. সে. ক. (২য় খণ্ড), পৃ ৪৫০।

১৩৫. Kling : op. cit., p. 159.

৪

বিলাত ভ্রমণ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পূর্বে বিলাত গমনের অর্থাৎ তৎকালীন সংস্কারে 'কালাপানি' পেরনোর দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রায় এক যুগের ব্যবধানে দ্বারকানাথ যখন বিলাত যাত্রা করেছিলেন তখনও বিলাত গমন সম্পর্কে সমাজে সেই সংস্কার যে দূর হয় নি তা বলাই বাহুল্য। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে, "১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে দ্বারকানাথের মনে য়ুরোপ-ভ্রমণের ইচ্ছা জাগে এবং পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভেই তিনি সে-ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বিদগ্ধ কৌতূহলের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।"[১] ব্যক্তিগত 'কৌতূহল' ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা দ্বারকানাথের ইউরোপ ভ্রমণ সম্পর্কে জানা যায় না।* দ্বারকানাথ দু'বার বিলাত গিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় যাত্রায় বিলাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

॥ প্রথম যাত্রা ॥

প্রথমবার বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে দ্বারকানাথ কলকাতায় তাঁর সংশ্লিষ্ট মহল থেকে বিদায় সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন ১৮৪২ সালের

* এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে, "দিগম্বরী দেবীর (দ্বারকানাথের পত্নী) স্বর্গপ্রাপ্তি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল অনুমান হয়। এই ঘটনার পর অবধি দ্বারকানাথ সাংসারিক কার্যে উদাসীনের মত হইয়া পড়িলেন এবং দিগম্বরীর স্মৃতিসম্বলিত স্বদেশ (গ্রন্থে 'আদেশ' মুদ্রিত হয়েছে) পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিলেন।" (দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, ১৩৭৬, পৃ ৭৫-৭৬)

৬ জানুয়ারি টাউন হলে, কলকাতার শেরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায়। এই "সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন য়ুরোপীয়।"[২] কিন্তু এই সভার প্রতিবেদনে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' অবশ্য লিখেছিলেন যে, "A meeting more decidedly representing the whole community,... .."[৩] মনে হয়, কিছু সংখ্যক দ্বারকানাথ-সংশ্লিষ্ট এদেশীয় ব্যক্তির উপস্থিতিই 'whole community' বলে উল্লেখ করায় সাহায্য করেছে। যা হোক, উক্ত সভায় টমাস টার্টন প্রস্তাব করেছিলেন যে দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত গুণাবলী উল্লেখ করে একটি মানপত্র দেওয়া হোক এবং এই সূত্রে টার্টন দ্বারকানাথকে অনুরোধ করেছিলেন যে, "ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি যেন কোন শিল্পীর সামনে উপবেশন করেন তাঁর একখানি প্রতিকৃতি আঁকানোর জন্যে—যাতে সে ছবি টাউন হলে রক্ষিত হতে পারে"।[৪] সভায় দ্বারকানাথকে যে-মানপত্র দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিশোরীচাঁদ লিখেছেন, "তার নিম্নলিখিত অংশগুলো পাঠকের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে সন্দেহ নেই :

"ইংলণ্ডের ব্রিটিশ প্রজারা ভারতীয় ভদ্রলোক সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা পোষণ করত, তোমাকে দেখে তাদের সে ধারণা পরিবর্তিত হবে ভেবে আমরা আনন্দিত।

"তোমার অক্লান্ত দাক্ষিণ্য, জীবনের সর্বস্তরে তোমার ঋজু চরিত্র যে সমস্ত কলকাতাবাসীর শ্রদ্ধা শুধু দাবি করে তা নয়, শ্রদ্ধা অর্জনও করেছে। আমরা আশা করি সে শ্রদ্ধা-ভক্তির সুর ইংলণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হবে।

"জাতি, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সৎ দাক্ষিণ্যমূলক কাজে তুমি স্বদেশবাসীর সামনে উদারতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। য়ুরোপীয় সমাজের কর্মধারা বা তাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে—এমন বিষয়ের উন্নতির জন্যে তুমি মুক্ত হস্তে দান করেছ। এ ছাড়া সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি প্রেমের প্রেরণায় তুমি মহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করছে।"[৫]

উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১৮৪২-এর ৮ জানুয়ারি দ্বারকানাথকে মানপত্র দেওয়া হয়। এই মানপত্রের উত্তরে দ্বারকানাথ বলেছিলেন: "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার দেশ এবং আমার পক্ষে এ হল একটি গৌরবময় মুহূর্ত; কারণ আমাদের য়ুরোপীয় নাগরিকদের কাছে একজন ভারতীয় এই প্রথম বোধ হয় এ রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মানের অধিকারী হলেন। এ যাবৎ আমার জীবনে প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার স্বদেশের উন্নতিসাধন। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমি গ্রেট ব্রিটেনের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সামাজিক গুণাবলীকেই আমার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এরূপ প্রচেষ্টার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন অবশ্য অপরাপর ব্যক্তি—বিশেষ করে আমার স্বর্গগত বন্ধু রামমোহন রায়।··আপনাদের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের জন্য আমি দু'ভাবে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ—কারণ তা আমার প্রতি উচ্চ অভিনন্দন-জ্ঞাপক হলেও আমার স্বদেশবাসার প্রতিও কম নয়। তাদের কাছে—শুধু তাদের কাছে নয়—সমস্ত পৃথিবীর কাছে তা প্রমাণ করেছে যে অন্তবানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত।....যে-প্রশংসাসূচক ভাষায় আপনারা আমাকে সে সম্মান জানিয়েছেন তার জন্যেও আপনাদের ধন্যবাদ দিই। আপনাদের সহৃদয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ অন্তরের স্পর্শ না পেলে যেটুকু সামান্য কাজ আমি করতে পেরেছি তাও বোধ হয় করা সম্ভব হত না। তা ছাড়া এই নগরীর মিলনায়তনে আজ আমার মত লোক যে-বিপুল গৌরবের অধিকারী হয়েছে তাও আপনাদের সহানুভূতি ছাড়া সম্ভব হত না। শুধু এ আশায় আমি এই দুর্লভ সম্মান আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব যে তা হয়ত আমার স্বদেশবাসীকে এমন কাজই করতে অনুপ্রাণিত করবে, যে-ধরণের কাজের জন্যে আপনারা আজ আমাকে উদারভাবে পুরস্কৃত করেছেন।"[৬]

অতএব, মানপত্র ও তার প্রত্যুত্তর দ্বারকানাথের জীবনচর্যার পরিধি সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে সন্দেহ নেই। দ্বারকানাথ সংশ্লিষ্ট

কলকাতা সমাজের ইংরেজ মহল তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল উক্ত মানপত্র তারই একটা নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারে। সেখানে দ্বারকানাথের বদান্যতা সম্পর্কে 'য়ুরোপীয় সমাজের কর্মধারা বা তাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে' বলে উল্লেখ করা এবং প্রত্যুত্তরে 'অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত' বলে উল্লেখ করার মধ্যে যে ঐকতান রয়েছে তা-ই ইউরোপীয় সমাজের কাছে দ্বারকানাথের গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম কারণ বলে মনে করা যায়।

১৮৪২ সালের ৯ জানুয়ারি দ্বারকানাথ ভাগনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, একান্ত সচিব পরমানন্দ মিত্র, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ম্যাকগাওয়ান, তিনজন ভৃত্য ও একজন মুসলমান পাচক সহ কলকাতা থেকে বিলাতাভিমুখে যাত্রা করেন। দ্বারকানাথের পরিচিত ইংরেজ সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, এইচ. এম. পার্কার, আর্চ বিশপ ক্যারু প্রভৃতি। রোমে পৌঁছে দ্বারকানাথ পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বারকানাথ যাত্রাপথের বৃত্তান্ত ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এ ডায়েরির কিছু কিছু অংশ কিশোরী চাঁদ মিত্র* উল্লেখ করেছেন এবং দ্বারকানাথ লিখিত ভ্রমণ সংক্রান্ত পত্র তৎকালীন সংবাদ পত্রেও (বিদ্যাদর্শন) প্রকাশিত হয়েছিল। যা হোক, দ্বারকানাথ ১০ জুন ১৮৪২ লণ্ডনে উপনীত হন এবং সেন্ট জর্জেস হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেন। দু'দিন পরেই প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীলের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়েছিল। দ্বারকানাথ বোর্ড অব কন্ট্রোল** এর সভাপতি লর্ড ফিট্জেরাল্ডের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং

* Kissory Chand Mittra : Memoir of Dwarkanath Tagore, 1870.

** তৎকালে বিলাতে ভারত-শাসন সম্পর্কিত 'হোম গভর্ণমেণ্ট' তিনটি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত ছিল—কোর্ট অব প্রোপ্রাইটরস্, কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ও বোর্ড অব কন্ট্রোল।

লর্ড ফিটজেরাল্ড ডিউক অব ওয়েলিংটন ও রাজপরিবারের সম্মানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বারকানাথকে পরিচয় করিয়ে দেন। লর্ড ফিটজেরাল্ড মহারাণীর সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দিলে (১৬ জুন, ১৮৪২) ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথকে প্রশ্ন করেছিলেন: ক'দিন হল এদেশে এসেছেন? উত্তরে দ্বারকানাথ বলেছিলেন: "মাত্র কয়েকদিন হল, হাজার হাজার মাইলের পথ-ক্লেশ বয়ে এই মহান জাতির মহারাণীকে দেখতে এসেছি; আমি যদি আগামীকাল চলে যাই তা হলেও আমি যথেষ্ট পেয়েছি মনে করব।"[৭] মহারাণী স্মিত হেসেছিলেন, দ্বারকানাথ ভিক্টোরিয়ার হস্ত চুম্বন করে চলে আসেন।[৭] ভিক্টোরিয়া তাঁর ডায়েরিতে দ্বারকানাথ সম্পর্কে যে মন্তব্য লিখেছিলেন ব্লেয়ার ক্লিঙের গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে: "The Brahmin speaks English remarkably well, and is very intelligent, interesting man."[৮] মহারাণীর নিকট বুদ্ধিমান ও আকর্ষনীয় ব্যক্তি বলে প্রতিভাত দ্বারকানাথ তৎকালের কট্টর ইংরেজ শাসনকর্তাদের দ্বারাও আপ্যায়িত হয়েছেন। যেমন, কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথকে সান্ধ্যভোজে (২২ জুন) আপ্যায়িত করা হয়। ভিক্টোরিয়ার আমন্ত্রণে দ্বারকানাথ সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ (২৩ জুন) পরিদর্শন করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মহারাণী দ্বারা অন্যান্য মান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বারকানাথ এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত ও আপ্যায়িত হন—ভিক্টোরিয়া ও তাঁর স্বামী দ্বারকানাথের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন এবং সেদিন টাঁকশালে তৈরি তিনটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারকানাথকে উপহার দেওয়া হয়।[৯] বিলাতে অবস্থানকালে দ্বারকানাথ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের (লর্ড ব্রুহাম, মারকুইস অব ল্যান্সডাউন, লর্ড পামারস্টোন, লর্ড আমহার্স্ট প্রভৃতি) সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং কোন কোন লর্ডের দ্বারা আপ্যায়িত দ্বারকানাথ নিজেও বহু সময়ে উচ্চ মহলের ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছেন। লণ্ডনে দ্বারকানাথের ব্যস্ততার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে: "সকাল ৮টা

থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আমি হয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে, নয়ত নিমন্ত্রণ রক্ষায় ব্যস্ত থাকি।"[১০] দ্বারকানাথ পার্লামেন্টের উভয় সভা, ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস প্রভৃতিও দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী উৎসাহ চরিতার্থ করার জন্য সসম্মানে নানা স্থান পরিদর্শন করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, রয়াল নার্সারি, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্কনোট মুদ্রণ, চিড়িয়াখানা, স্কুল, হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, ডাচেস অব সাদারল্যাণ্ডের সুরম্য 'স্ট্যাফোর্ড হাউস' এবং চাটস্‌ওয়ার্থে ডিউক অব ডেভনশায়ারের প্রাসাদ। এ সব ছাড়া ডক, নিউ ক্যাসল্‌-এর কয়লা খনি অঞ্চল, ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পাঞ্চল, শেফিল্ডের লৌহ-ইস্পাত কারখানাসমূহও দ্বারকানাথ পরিদর্শন করেছিলেন। দ্বারকানাথ বার্মিংহামের জাহাজ, লণ্ডনের রেলওয়ে দেখে লিখেছিলেন: "These are the greatest wonders of England, making places formerly considered distant, close at hand, and particularly striking to a stranger who previously had seen nothing on so grand a scale."[১১] গীর্জার উপাসনায়ও দ্বারকানাথ যোগ দিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, "একটি ধর্মোপদেশই যথেষ্ট মনে হওয়ায় আমি প্রথমটির পরেই চলে এলাম, কারণ এটা ধর্মোপদেশের চাইতে আমার কাছে বক্তৃতার মতই শোনাল।"[১২] এর দ্বারা দ্বারকানাথের ধর্ম সম্পর্কে বিচারশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নাচ-গান-থিয়েটার ও আমোদ-প্রমোদ দ্বারকানাথের ভ্রমণ সূচী থেকে বাদ যায় নি। তিনি পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন: "With operas and theatres I need not tell you how much I have been gratified. The beauty of the ladies in England puts me in mind of the fairy tales. What I read in my younger days in the Persian tales, I begin to see in London. If a man has wealth, this is the country to enjoy it in."[১৩] দ্বারকানাথের সম্পদ ছিল এবং তিনি সে-দেশকে চরম উপভোগও করেছিলেন বলা যায়। বিলাতে দ্বারকানাথের দিনগুলি নানা ধরনের

আনন্দ-উপভোগের মধ্যে যে কেটেছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় Monthly Times (4 August, 1842)-এর একটি প্রতিবেদনে: "This eminent Hindoo has been, and indeed is, the lion of the season. He has dined more than once with her Majesty—played whist with Prince Albert and the Duchess of Kent—eaten venison and turtle at the civic feast—drank *Tunda simkin* at the Duchess of Buccleuch's, and, we have heard, danced at Almack's. Beau Brummell*, in all his glory, was never one half so much in demand as our good old friend Tagore ; thus it is, "some men are born great— some achieve greatness— and some have greatness thrust upon them." "[১৪] প্রশ্ন জাগে, দ্বারকানাথের ওপরে 'greatness' চাপিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করার জন্যই কি এখানে প্রতিবেদক শেষোক্ত বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছেন ?

লণ্ডনে মেয়রের ভোজসভায় আমন্ত্রিত দ্বারকানাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে বিষয় পূর্বাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বলে এখানে বিস্তৃত পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে উক্ত ভোজসভায় আত্মপ্রশংসা শুনে মুগ্ধ দ্বারকানাথ যেকথা বলেছিলেন (যেমন: 'এ ইংলণ্ডই ক্লাইভ ও কর্ণয়ালিশকে পাঠিয়েছে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বাহুবলের সাহায্যে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন করতে।') তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিলাতের 'ভারতবন্ধু' ইংরেজদের মধ্যেও যেমন হয়েছিল তেমনি এদেশের পত্র-পত্রিকায়ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল। প্রায় অনুরূপ মতামতই পুনরায় দ্বারকানাথ ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর প্যারিসে অবস্থানকালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ যখন তাঁকে প্রশংসাসূচক চিঠি দিয়ে জানায় যে দ্বারকানাথকে তারা একটি স্বর্ণপদক দিতে ইচ্ছুক। দ্বারকানাথ

* Beau Brummell, অর্থাৎ George Brummell (1778-1840)—তৎকালে বিলাতের ইংরেজ সমাজে ফ্যাশনের নায়ক, আমুদে সহচর ও জুয়াড়ী হিসেবে খ্যাত ছিল; কিন্তু এ সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ির জন্য তাকে জেলে যেতে হয়েছিল।

প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন : "বিধাতার অভিপ্রায়ে যে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ষার দায়িত্ব এ সরকারের উপর এসে পড়েছে, তাদের কল্যাণ এবং প্রগতির জন্যে সরকারের অকৃত্রিম উদার আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ প্রচেষ্টা সমস্ত পৃথিবীর কাছেই প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"[১৫] পূর্বাধ্যায়ে দ্বারকানাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বারকানাথ স্বদেশের দুঃখ, দৈন্য অত্যাচারজনিত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে কোম্পানি শাসনের জয়গান করেছিলেন সেই চিঠিতে।* বিলাতে অবস্থানকালে দ্বারকানাথ স্বদেশের বা স্বদেশবাসীর কথা বিস্মৃত হওয়াতে 'বেঙ্গল হরকরা'য় (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪২) প্রকাশিত এক পত্রে বলা হয়েছিল যে—"... it appears that it would be too much to expect such patriotism at the hands of a Baboo...If he has not the heart to be manly, he ought at least to practice the negative virtue of silence." বস্তুত উক্ত পত্র প্রেরকের প্রত্যাশানুগ মানসিকতায় দ্বারকানাথ স্থিত ছিলেন না বলেই ভাবতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করা থেকে তিনি নিবৃত্ত হন নি। ব্লেয়ার ক্লিঙ দ্বারকানাথকে কোম্পানি সরকারের সাফল্যের প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন—"Dwarkanath was the symbol of the success of the company's government.' ('Partner in Empire', p. 167)—বাস্তবেও দ্বারকানাথ ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-স্বার্থের পরিপোষক রূপে নিজেকে প্রতিভাত করায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

১৮৪২-এর আগস্ট মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর এডিনবরা শহরের কাউন্সিল কর্তৃক 'ফ্রিডম অব দি সিটি' লাভ করেন এবং একজন হিন্দু ভদ্রলোককে এরূপ সম্মান দেখানোতে সেখানকার সংবাদপত্রে ঘটনাটি অভূতপূর্ব বলে উল্লেখ করা হয়।[১৬] এডিনবরাতে দ্বিতীয়বার

* কৃষ্ণ কৃপালিনি উক্ত চিঠিতে ব্যক্ত দ্বারকানাথের দাসসুলভ মনোবৃত্তির সমালোচনা করেছেন—টীকা 'ন' দ্রষ্টব্য।

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দ্বারকানাথের সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বারকানাথকে যত উদারতার সঙ্গে সর্বত্র গ্রহণ করা হোক না কেন কোনক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা উপনিবেশ এবং সে-দেশকে ভালভাবে রক্ষা করাই যে শাসকশক্তির কর্তব্য সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে বিলাতের মানপত্র দানকারী মহল ক্রুটি করে নি। দ্বারকানাথ 'ইউনিটারিয়ান সোসাইটি অব এডিনবরা' এবং 'কমিটি অব দি এডিনবরা এমিগ্রেশন অ্যাণ্ড অ্যাবরিজিনস্ সোসাইটি' থেকে মানপত্র লাভ করেছিলেন। শেষোক্ত সংগঠনটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রো দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য গঠিত এবং ভারতের পাহাড় অঞ্চল থেকে কুলি চালান (Hill Coolie Emigration) বিষয়েও উক্ত সংগঠন প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে প্রদত্ত মানপত্রেও উল্লেখ করা হয় যে—"যথাশীঘ্র অগাধ অফুরন্ত ঐশ্বর্য আহরণের ক্ষেত্র হিসেবে আপনার দেশ গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীদের কাছে এতদিন ছিল তুলনা রহিত। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি আমাদের বিজয় এবং সাফল্যের অভিযানে আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের উপর বহু গুরুতর অন্যায় করেছি। ...যে-ভুল আমরা করেছি এখন দরকার সে ভুল শোধরানো। আপনাদের দেশ অধিকার করার ফলে যে পবিত্র দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়েছে সেগুলো এখন থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা কর্তব্য।

"আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল বিজয়োদ্ধত তরবারিকে চিরকালের জন্যে কোষবদ্ধ করা, অত্যাচারের লৌহদণ্ডকে চিরকালের জন্যে ভেঙ্গে ফেলা এবং অনিচ্ছাকৃত অধীনতাকে সর্বত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যে রূপান্তরিত করা। যে-সমস্ত প্রদেশ আমাদের পরিচালনাধীন সেই-গুলির সর্বত্র সুবিবেচিত, উদার এবং সমদর্শী শাসনের ব্যবস্থা করে এই আনুগত্যকে চিরস্থায়ী করতে হবে।

"আমাদের এ আকাঙ্ক্ষাকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে আমরা

নিঃসন্দেহে আশা করব আপনি আমাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন এবং সে প্রয়াস যাতে সফল হয় সেজন্যে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করবেন।"[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ শাসকদের কাছে 'সেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যে'র নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে যে গণ্য হয়েছিলেন তা দ্বারকানাথের প্রতি শাসকশক্তির ব্যবহার থেকেও উপলব্ধি করা যায়।

দ্বারকানাথ যখন গ্লাসগো পরিদর্শনে যান তখন চার্টিস্ট আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন এবং চার্টিস্টদের একটি মিছিল দেখে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেকথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এক চিঠিতে ব্যক্তও করেছিলেন: "At present some 300,000 people are out of employ which poor devils are being roughly handled by the troops. They may talk of the starvation of the Hill Coolies in India, but I see around me still more distress." (Bengal Spectator, 1 Nov. 1842).[১৮] লিভারপুলে দ্বারকানাথ ইঞ্জিন তৈরির কারখানায় 'দ্বারকানাথ' নামক জাহাজের জন্য যে ইঞ্জিন নির্মিত হচ্ছিল তা প্রত্যক্ষ করেন। তারপরে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের পথে ব্রিস্টলে যান সেখানে রামমোহন রায়ের সমাধি পরিদর্শন করেন এবং নগরীর মধ্যে (Stapleton Grove থেকে Arno's Vale-এ) যাতে সে সমাধি স্থানান্তরিত হয় ও হিন্দুরীতিতে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ তার ওপর যাতে স্থান পায় তার ব্যবস্থা করেন। দ্বারকানাথ লণ্ডনে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে* ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ পান। এই ভোজসভায় দ্বারকানাথ কলকাতা টাউন হলে স্থাপনের জন্য রাজদম্পতির পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি তাঁর মারফৎ দিতে মহারাণীকে অনুরোধ করেছিলেন। দ্বারকানাথের অনুরোধ রাজদম্পতি অনুমোদন করেন এবং ভিক্টোরিয়া

* কিশোরীচাঁদ মিত্রের উল্লেখ অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর এবং Calcutta Star পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৪২।

দ্বারকানাথের জন্য নিজের ও স্বামীর ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রতিকৃতি নির্মাণেরও ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন।[১৯] দ্বারকানাথ মহারাণীকে শাল ও তাঁর স্বামীকে একটি মূল্যবান ছোরা উপহার দেন। মহারাণী দ্বারকানাথকে একটি পদক উপহার দিয়েছিলেন এবং সেই পদক গলায় পরার জন্য সোনার হার লাভ করেছিলেন ল্যান্সলট ডেণ্ট অব চায়না-র কাছ থেকে। এ সম্পর্কে দ্বারকানাথ ১৫ অক্টোবর ১৮৪২-এ ডেণ্টকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সে চিঠিতে ব্যক্ত দ্বারকানাথের মনোভাব উল্লেখ্য বলে মনে হয়। দ্বারকানাথ উক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন: 'Your meaning in sending me the chain cannot be disguised. You are a *China* Man, and, by linking the Medal and your gift together, you plainly signify your wish to connect Her Britanic Majesty and the Celestial Empire together by this *strongest* and *purest* cord ,& so you send me a golden Cable of real Factory stuff, to be attached to the image and superscription of your sovereign.

'Well ! all I can say is that if we are to be ruled by the women, I don't know a better, and if she treats everybody as she has treated me I wish she was queen of all the world.

'I accept with every feeling that becomes me, your costly gift, though it needed no rope to bind us together. You will be in good company, & you have made it impossible for me to look at the Queen *without thinking of you* ; and every time my loyalty prompts me to say— "Long Live the Queen"— I shall be obliged to add "and Lancelot Dent." '[২০] (উইকস্-রূপায়িত মর্মর-মূর্তিটিতে দ্বারকানাথের কণ্ঠলগ্ন উক্ত (?) স্বর্ণহারের সঙ্গে বিলম্বিত ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি যুক্ত পদক বক্ষস্থলে উৎকীর্ণ দেখা যায়।)*

টীকা 'প' দ্রষ্টব্য

দ্বারকানাথের ইংল্যাণ্ড ত্যাগের প্রাক্কালে Cymreigyddion Y Fenni (আদিম কেলটিক ঐতিহ্য ও বৈদিক ঐতিহ্যের যোগসূত্রে বিশ্বাসী সংস্থা) দ্বারকানাথকে সংবর্ধনা জানায়। সংবর্ধনা ভাষণে উল্লেখ করা হয় যে, সিমরিগরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশ থেকে আগমন করেছিল বলা হয় এবং ড্রুইদীয় (কেলটিক পুরোহিত শ্রেণীর) ও ব্রাহ্মণ্য আচার, সংস্কৃত ও সিমরেগ ভাষার মধ্যে মিল রয়েছে —এ সব ঐতিহ্য ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্যতা হারিয়েছে সত্য, তা হলেও হিন্দু ও কেলটিক জাতির মধ্যে বা মানব সমাজের ঐ আদিম শাখাগুলির মধ্যে যে সমোদ্ভবতার সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[২১]

লণ্ডনে অবস্থানকালে দ্বারকানাথকে কোন রাজকীয় উপাধি দ্বারা ভূষিত না করায় দ্বারকানাথের পরিচিত মহলে কিছুটা আলোড়ন হয়েছিল। 'নাইটহুড' বা 'ব্যারনেট' দ্বারা দ্বারকানাথ সম্মানিত হবেন এমন প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করাও হয়েছিল। দ্বারকানাথের বন্ধু জেমস্ ইয়ং (ইনি এক সময়ে কলকাতার Alexander and Co.-এর কর্তাব্যক্তি ছিলেন, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ছিলেন এবং বিলাতে লর্ড ব্রুহামের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন) লর্ড ব্রুহামকে লিখেছিলেন যে, 'I do wish they would make him a Baronet—the *premier* Indian Baronet.'[২২] এর আগে বোম্বাইয়ের জামসেদ্‌জী জীজাভাই 'নাইটহুড' উপাধি দ্বারা ভূষিত হওয়ায় Calcutta Star (24 Nov. 1842) পত্রিকায় জেমস্ হিউম লিখেছিলেন: "We cannot then believe that such a man as Dwarkanath Tagore will be suffered to leave our shores, undistinguished by some mark, which shall demonstrate to his countrymen the estimation in which his rare virtues are held by the present administration"[২৩] এবং দ্বারকনাথ ঠাকুরও যে বিশ্বাস করেছিলেন ঐ জাতীয় কোন রাজকীয় সম্মানে তিনি ভূষিত হতে পারেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিলাত ত্যাগের

পূর্বে 'কলেজ অব আর্মস্'-এ দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীক-চিহ্ন (Coat of Arms)* নিবন্ধীকরণের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা থেকে। বস্তুত দ্বারকানাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে ঐ প্রতীক চিহ্নের নিবন্ধীকৃত হওয়ার সংবাদ এসেছিল। প্রতীক চিহ্নটি নিবন্ধীকরণের ব্যাপারে লেখা হয়েছিল: "Dwarkanath Tagore of Bengal in the East Indies, Zumeendar and Merchant in the Commission of the Peace for the Town of Calcutta… he has held the important post of Dewan or Head Officer in several civil departments under the Government of India."[২৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃষ্ণ কৃপালনি Fisher's Colonial Magazine (Vol. 1, 1842)-এর সূত্রে বলেছেন যে, বেন্টিঙ্ক দ্বারকানাকে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করতে 'পীড়াপীড়ি' করেছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ তা গ্রহণে অস্বীকৃত হন।[২৫] বাস্তবে দেখা যায়, বেন্টিঙ্ক এদেশ ত্যাগ করার পর ১৮৩৭ সালে রাধাকান্ত দেব সরকার কর্তৃক 'রাজা' উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন।[২৬] দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ঐরূপ সম্মানে ভূষিত না করাতেই বোধ হয় ১৮৩৮ সালে

---

* এই Coat of Arms এবং অন্যান্য কিছু মানপত্র ও নিদর্শন রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়ামে প্রদর্শিত রয়েছে। আলোচিত প্রতীক চিহ্নের ছবি ছাড়াও পারিবারিক ভাবে ব্যবহৃত সীলমোহরও সংরক্ষিত রয়েছে। এই Coat of Arms বা পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীকের ছবিটিকে এভাবে বর্ণনা করা যায়—একটা শীল্ডের আকৃতির মধ্যে নীচে তরঙ্গ লাঞ্ছিত ভাসমান জাহাজ, মাঝখানে দু'পাশে দু'টি চিত্রের (scroll) মধ্যে পৃষ্ঠাখোলা বই ও ওপরের দিকে দু'টি পদ্মাকৃতি ফুল। এ সবকিছুর মাথায় শুঁড়ে পদ্মফুল নিয়ে দাঁড়ান হাতীর পশ্চাতে পতাকা উড়ছে। সমগ্র চিত্রটির নীচে লেখা রয়েছে—'Works will win!'—এই প্রতীক চিহ্নটি ঠাকুর পরিবারে পরিচয় জ্ঞাপক প্রতীকরূপে এবং সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল দীর্ঘদিন, এমন কি রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিকে চিঠি-পত্রের কাগজে এই প্রতীক চিহ্নের অনুকৃত সীলমোহর ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। (Kripalani : Dwarkanath Tagore, 1981, pp. 175-76).

(২৪ ফেব্রুয়ারি) সমাচার দর্পন-এ প্রকাশিত হয়েছিল যে—"দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর উপাধি পদ প্রাপ্তির পাত্র হয়েন তবে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন।"[২৭] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বারকানাথকে 'রাজা' উপাধি না দেওয়ায় সমকালীন সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে কৃপালনির তথ্যানুসারে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, দ্বারকানাথ দেশীয় 'রাজা' উপাধি লাভে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজে শ্রদ্ধেয় 'নাইটহুড' বা 'বেরনেট' খেতাব তাঁর পছন্দ ছিল না সেরূপ চিন্তা করার অবকাশ কম। কারণ পূর্বোক্ত 'রাজা' খেতাব গ্রহণের অস্বীকৃতির সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথের বিলাতে অবস্থান কালে তাঁর ইংরেজ সুহৃদরা না হলে এ বিষয়ে উপরে বর্ণিত উৎসাহ দেখাত না। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিলাতে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ মহল রোমান রীতি অনুসরণ করে দ্বারকানাথকে পূর্ণ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দানের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছিল।[২৮] কিন্তু কোন প্রকার খেতাবী সম্মানেই দ্বারকানাথকে ভূষিত করা হয় নি। দ্বারকানাথকে প্রকৃত বা স্থায়ী রাজকীয় পদমর্যাদানুগ খেতাব কেন দেওয়া হল না সে প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। একজন পর্যালোচকের মতে, দ্বারকানাথের সামাজিক মার্যাদা ও সৌভাগ্য ব্রিটিশদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ("Dwarkanath, the representative zamindar, might criticize the government, but he did so as an insider, a confidant of governors-general, a man whose social position and fortune depended on the British.")[২৯] দ্বারকানাথ সম্পর্কে এরূপ ধারণাকে যদি ব্রিটিশদের কাছ থেকে তাঁর রাজকীয় খেতাব লাভের প্রয়োজনীয়তাকে সীমিত করার অন্যতম কারণ বলে ধরা যায় তা হলে বলতে হয় নিজের সম্পর্কে এরূপ ধারণা সঞ্চারের উৎস ছিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ।

যা হোক, দ্বারকানাথের বিলাতে অবস্থান কালে যে-সকল 'উদারপন্থী' নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল লর্ড ব্রুহাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। দ্বারকানাথ ব্রুহামের সঙ্গে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

নিয়ে কথা বলেছিলেন এবং ব্রুহাম প্রতিষ্ঠিত Society for the Diffusion of Useful Knowledge-এর পক্ষ থেকে দ্বারকানাথকে ইংল্যাণ্ড ত্যাগকালে উপহারও দেওয়া হয়েছিল। দ্বারকানাথ সে বিদায় সংবর্ধনায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আগামী বছর তিনি আবার এসে উক্ত সোসাইটির কাজে অংশ নেবেন।[৩০]

১৮৪২ সালের ১৫ অক্টোবর দ্বারকানাথ ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে প্যারিসে যান। সেখানে ১৮ অক্টোবর তিনি রাজা লুই ফিলিপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ সময়ে বেলজিয়ামের রাজা ও রাণীর সঙ্গে লুই ফিলিপ দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দেন।[৩১] ভ্রমণ শেষে ১৮৪২-এর ডিসেম্বর মাসে দ্বারকানাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য ও বাগ্মী খ্যাত জর্জ টমসনকে সঙ্গে করে স্বদেশে ফিরেছিলেন।

১৮৪৪ সালের শেষ দিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে এক চিঠিতে জানানো হয় যে দ্বারকানাথের অনুরোধ অনুযায়ী উপহারের জন্য দুটি (ভিক্টোরিয়া ও তাঁর স্বামীর) প্রতিকৃতি জাহাজে পাঠানো হয়েছে। প্রতিকৃতির জন্য মহারাণীকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণের নিমিত্ত ১ মার্চ ১৮৪৫-এ টাউন হলে সভা হয়। সভায় দ্বারকানাথের প্রশংসা করা হয়। উত্তরে দ্বারকানাথ বলেন: তিনি আবার বিলাত যাচ্ছেন এবং তা দূরদেশ দেখার সন্তোষ ভিন্ন কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর সঙ্গে দেশের লোকের মতপার্থক্য আছে সন্দেহ নেই, তবে তিনি সকলকেই বলবেন যে তাঁর ভাগ্য যে-দিকেই যাক না তাদের ও দেশের স্বার্থের কথা তাঁর মনে থাকবে এবং সে-স্বার্থের উন্নতি ঘটাতে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করবেন না।[৩২]

॥ দ্বিতীয় যাত্রা / মৃত্যু ॥

১৮৪৫ সালের ৮ মার্চ দ্বারকানাথ কলকাতা থেকে দ্বিতীয়বার

বিলাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডব্লিউ. ব্যাংস, একান্ত সচিব টি. আর. সেফ (ইনি প্রথমবার বিলাতে দ্বারকানাথের সচিবের কাজ করেছিলেন)। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য মনোনীত মেডিকেল কলেজের চারজন ছাত্র, তাঁদের শিক্ষক ডাক্তার এইচ. এইচ. গুডিভ। কিশোরীচাঁদ মিত্র যাত্রাপথে দ্বারকানাথের যে-সকল অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কায়রোতে ভাইসরয় মহম্মদ আলীর নিকট দ্বারকানাথের রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ এবং মরুভূমির উপর দিয়ে রেলপথ নির্মাণের বিষয়ে দ্বারকানাথের সঙ্গে ভাইসরয়ের আলোচনা।[৩৩] কৃষ্ণ কৃপালনি উল্লেখ করেছেন যে, ৮৪ বছর বয়স্ক কৌতুকপ্রিয় খাদিব (Khedive) দ্বারকানাথকে তাঁর মাথার পাগড়ি ও হৃদয়খানিকে সুন্দরী ইংরেজ রমণীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[৩৪] আলেকজান্দ্রা, মাল্টা হয়ে দ্বারকানাথ যখন নেপল্‌সে উপস্থিত হন তখন দ্বারকানাথকে তোপধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল।[৩৫] সেখানকার ব্রিটিশ রাজদূত দ্বারকানাথকে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দ্বারকানাথ সাথী সহ ভিসুভিয়াস, পম্পিয়াই প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। নেপল্‌স থেকে লেগহর্ণ, পিসা, জেনোয়া, মার্সাই, বোর্দো হয়ে প্যারিসে যান। প্যারিসে লুই ফিলিপের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং দিন পনের রাজকীয় খানা-পিনা ও আমোদ-অমোদে অতিবাহিত করেন।

১৮৪৫ সালের ২১ জুন* দ্বারকানাথ লণ্ডনে উপস্থিত হন। এবারেও তিনি সেন্ট জর্জেস হোটেলেই বাসস্থান ঠিক করেছিলেন।

---

* কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন ২৪ জুন, আর দ্বারকানাথের সঙ্গী নবীনচন্দ্র ২১ জুন গিরীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: "I am only arrived to-day an hour ago...."

পুত্র ও ভাগিনেয়র শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন দ্বারকানাথ—নগেন্দ্রনাথকে ডঃ ড্রুমণ্ডের শিক্ষাধীনে রাখা হয়েছিল এবং নবীনচন্দ্রকে কার-ঠাকুর কোম্পানির এজেন্ট রবার্টস মিচেল* অ্যাণ্ড কোম্পানিতে সহকারী করা হয়েছিল।[৩৬]

দ্বারকানাথ কয়েকদিনের মধ্যেই ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ লাভ করেন। তিনি মহারাণীর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলি মহারাণীর কাছে পাঠানো হলে মহারাণী কয়েকটি চীনা অলংকার, দিল্লীর তৈরি সোনার তাগা ও চুরি গ্রহণ করেছিলেন ; আর প্রিন্স অ্যালবার্ট গ্রহণ করেছিলেন একটি সুন্দর শালের চোগা।[৩৭] দ্বারকানাথ এবার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে পূর্ব-প্রতিশ্রুত রাজদম্পতির ক্ষুদ্রকায় প্রতিকৃতি উপহার পেলেন। ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্টের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিকৃতিদ্বয়ের নীচে ৮ জুলাই ১৮৪৫ তারিখ লেখা ছিল।[৩৮] ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দ্বারকানাথের কথাবার্তার প্রসঙ্গ ছিল : দ্বারকানাথের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল ও তিনি কীভাবে গত দু'বছর কাটিয়েছেন। উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রিন্স অ্যালবার্ট ও বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড ভারত সম্পর্কে নিবাধ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তবে আলোচনার বিষয়বস্তু জানা যায় না। আলাপে মহারাণীর শেষ জিজ্ঞাসা ছিল— "How is Hardinge when did you see him last. I hope he is doing all to improve the Country."[৩৯]

প্রথমবার বিলাত পরিক্রমাতেও যেমন দ্বিতীয়বারের পরিক্রমাতেও তেমনি দ্বারকানাথ বিভিন্ন মহল থেকে আপ্যায়ন লাভ করেছিলেন। দ্বারকানাথ নিজেও অতিথিদের আপ্যায়নে কুণ্ঠা দেখান নি। প্রথমবার চার্লস ডিকেন্স ও দু'চার জন কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, এবার তিনি 'পাঞ্চ' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর জন্য

---

* কিশোরীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থে (বঙ্গানুবাদ, পৃ ১২৯) 'মাইকেল' মুদ্রিত হয়েছে।

একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। উক্ত ভোজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চার্লস ডিকেন্স, উইলিয়ম থ্যাকারে, ডগলাস্ জেরোল্ড, মার্ক লেমন, জে. ডব্লিউ. মেহিউ ও কাউন্ট দ্য' অরসে। যদিও কাউন্ট 'পাঞ্চ' ভুক্ত ছিলেন তবু তিনি নিজেই যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪০] কাউন্ট দ্য' অরসে দ্বারকানাথের প্রতিকৃতিও অঙ্কন করেছিলেন। দ্বারকানাথ প্রদত্ত ভোজ-আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে ইংরেজ সমাজের উচ্চকোটির ব্যক্তিরাও (ডিউক ও ডাচেস পর্যায়ভুক্ত) যেমন আমন্ত্রিত হতেন তেমনি আবার শিল্প-সাহিত্য ও নৃত্য-গীত-অভিনয় সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও মহিলারাও বাদ যেতেন না। বিশেষ করে শেষোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশায় দ্বারকানাথ যে বেশী আনন্দ অনুভব করতেন তারও দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৪১] অবশ্য ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্নে এ সকল দৃষ্টান্ত ততটা আলোচ্য নয়; কিন্তু দ্বারকানাথ এভাবে আনন্দ-স্ফূর্তির আয়োজন করে নিজের সময় ও সম্পদ যে বহুল পরিমাণে ব্যয় করেছিলেন তা উল্লেখনীয় সন্দেহ নেই।

১৮৪৫ সালের শরৎকালে দ্বারকানাথ আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণে যান এবং ডাবলিনে রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। তিনি ডাবলিন থেকে বেলফাস্ট যান এবং সেখানে হোটেলে তাঁকে দেখবার জন্য কৌতূহলী জনতা ভিড় করত। পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হার্টলে সেখানে দ্বারকানাথের দর্শন-প্রার্থী তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন—"তাঁকে (বন্ধুকে) অভিবাদন জানানো হলে তিনি যেন হাঁটু গেড়ে বসে প্রিন্সের হস্ত চুম্বন করেন'।[৪২] (ইউরোপে দ্বারকানাথকে প্রিন্স বলেই সম্বোধন করা হতো) আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্কে ও'কোনেলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ফাদার ম্যাথুর সঙ্গে দ্বারকানাথের সাক্ষাৎকার উল্লেখ্য। কারণ, ম্যাথুর উদার চরিত্রে ও কল্যাণ কাজে মুগ্ধ দ্বারকানাথ ম্যাথুর একটি প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য শিল্পী লিহি (Leahy)-কে

নিয়োগ করেছিলেন।[৪৩] কিন্তু দ্বারকানাথকে লেখা ম্যাথুর একটি চিঠি থেকে জানা যায় দ্বারকানাথ ফাদার ম্যাথ্যুকে অর্থ দান করেছিলেন এবং প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিষয়ও উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাথুর চিঠিতে লেখা হয়েছিল : "...I shall most cheerfully devote a few hours to a Potrait Painter. A consent to appear with the Prince of Hindoos, side by side, upon the same canvas, may savour of vanity, yet I can refuse you nothing.—

"The magnificent Donation you placed at my disposal for charitable purposes—known [illegible] for the education of youth... [illegible] Reverend schools."[৪৪]

১৮৪৫ সালের শীতকালে দ্বারকানাথ প্যারিসে যান এবং সেখানে (১৮ ডিসেম্বর—৯ মার্চ ১৮৪৬)[৪৫] একটি উচ্চশ্রেণীর হোটেলে অবস্থান করেন।[৪৬] রাজকীয় আমোদ-ফূর্তিতেই যে প্যারিসে দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল কৃষ্ণ কৃপালনির গ্রন্থ* থেকে সে সম্পর্কে বহু ঘটনার কথা জানা যায়। অতিথি আপ্যায়নে দ্বারকানাথ যে সকল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করতেন সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে। লণ্ডনের জার্নাল 'লিটারারি হেরাল্ড'-এ প্রকাশিত (বেঙ্গল হরকরায় উদ্ধৃত) একটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছিল যে—"Dwarkanath Tagore.-Who has not heard of this nabob or princely Indian merchant, whose cashmere shawls, diamonds, and Asiatic magnificence are turning the best and wisest of our feminine heads? Everything appertaining to this personage is absolutely fabulous—his fortune, dress, habits, manners, and existence. The last surpasses in reality the most extraordinary dream; his life is a perpetual romance, of which not the least curious passage

* Krishna Kripalani ; Dwarkanath Tagore,

will be his sojourn in the French capital."* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্লেয়ার ক্লিঙ লিখেছে৲ ar. 's private life was a favourite subject for the scandal-mongers."[৪৭] যা হোক, দ্বারকানাথ প্রদত্ত ভোজ-অনুষ্ঠান আরব্য রজনীর কিংবদন্তী স্মরণ করায় বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৮] নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর ম্যাক্স ম্যুলার সম্পর্কিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকানাথ যখন প্যারিসে ছিলেন তখন তিনি "creating as great a sensation in the French capital as Dumas's *Count of Monte Cristo*."[৪৯]

প্যারিসে দ্বারকানাথের রাজকীয় জীবনযাত্রার কথা ম্যাক্স ম্যুলারও উল্লেখ করেছেন। ম্যাক্স ম্যুলারের সঙ্গে দ্বারকানাথের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ম্যুলারের স্মৃতিগ্রন্থ Auld Lang Syne এ রয়েছে।[৫০] নীরদ চৌধুরী বলেছেন: "The first Indian he (Müller) met was Dwarkanath Tagore,...."[৫১] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে দ্বারকানাথ-ম্যুলারের মেলা-মেশার বিবরণ ম্যাক্স ম্যুলারের স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের প্রায় অনুরূপ। সেজন্য উক্ত সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ম্যাক্স ম্যুলারের বিবৃতি** সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্ত গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত করা হল। ম্যুলার বলেছেন—"একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসর বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করিতাম, এবং যখন দেখলাম

---

* The Bengal Hurkaru, 8 June 1846; vide K. Kripalani, op. cit., pp. 226-27.

** সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন তখন ম্যাক্স ম্যুলার সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষান্তে সত্যেন্দ্রনাথ ম্যাক্স ম্যুলারের সঙ্গে দেখা করলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল সেখানেই দ্বারকানাথ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল।

যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসরের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে বড় বেশী বিলম্ব হ'ল না। প্রোফেসর বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'ল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।

"দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হলেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তখন তিনি ইনষ্টিট্যুট্-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসর বারনুফের সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসর তাঁকে নিজের ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফারাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বারকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলী-গুলি ফরাসী তর্জ্জমার পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা! এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম!' তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল।

"যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হ'ল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম— এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লাম একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়, পারসিক গজল, এবং আমিও তাতে বিশেষ কোন মাধুর্য্য পেলাম না। খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ

অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বল্লেন, 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলিতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হ'ল যে, গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বল্লেন, 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি; আমি ক্রমাগত চর্চ্চা করতে লাগলাম যতক্ষণ না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এইরূপ। তোমরা বল আমাদের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, আমাদের দর্শন দর্শনই নয়। ইয়োরোপ যাহা প্রকাশ করে আমরা চেষ্টা করি তাহা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে, কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ যাহা প্রকাশ করে তাকে অবহেলা করি না। আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্য দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেন নি।

"এই কথাগুলি বলতে বলতে তিনি ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য আমি অন্য বিষয়ের অবতারণা করে বল্লাম যে, 'আমি শুনেছি ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তি অঙ্কশাস্ত্র হইতে।' আমি একবার সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা সংস্কৃত খস্‌ড়া দেখেছিলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রোফেসর উইলসন একজন সঙ্গীতজ্ঞ লোক এবং তিনি বহু বৎসর ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে আমি ঐ বিষয়ে জিসাসা করেছিলাম এবং ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা শিখতে

ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম ; কিন্তু তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন না। তিনি বল্লেন যে, তিনি গান শিখবার জন্য একবার একজন কালোয়াতের কাছে গিয়েছিলেন, তাতে কালোয়াত বলেন যে, ছয় মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন করে তাঁর কাছে এসে গান শিখলে পর তিনি বলতে পারবেন যে এই ছাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা শিখবার উপযুক্ত কি না এবং তারপর একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষা করলে তবে পারদর্শী হ'তে পারবেন। এই কথা শুনে প্রোফেসার উইল্‌সন্ সেখানেই ক্ষান্ত দিলেন। সঙ্গীত রত্নাকর প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত পুস্তকগুলি লাইব্রেরীতে দেখে আমার বড়ই লোভ হ'ত শিখবার জন্য, কিন্তু প্রোফেসার উইলসনের মুখে ঐ কথা শুনে পর্য্যন্ত আমাকেও ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। তোমাদের ঠাকুর পরিবারের মধ্যে আর একজন সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আছেন— তিনি হচ্ছেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

"তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কেন জানি না, তিনি ব্রাহ্মণকুলকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না এবং একদিন যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি না, তিনি হেসে বল্লেন, 'আমি তো চিরকাল বহুতর ব্রাহ্মণকে পোষণ করে আসছি, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত !' কিন্তু তিনি যে কেবল দেশীয় ব্রাহ্মণদেরই হীন চক্ষে দেখতেন তা নয়—তিনি যাদের নামকরণ করেছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ',— তাদেরও সমান নীচ চক্ষে দেখতেন। যদিও তিনি ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাদ্রিকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন। তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও পারমার্থিক সংবাদপত্র পড়তেন। তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্ন সহকারে পাদ্রিদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন। সে এক অদ্ভুত সংগ্রহ — অনেক সময় আমি ভাবি যে

সে খাতাখানির কি দশা হ'ল। তোমার ঋষিপ্রতিম পিতা কখনই সে খাতা ল'য়ে রহস্য করেন নি নিশ্চয়ই। কিন্তু যখনই খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ বের করতেন। অবশ্য আমি বলতাম যে, কোন দেশেরই ধর্ম্মযাজকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে ধর্ম্মের বিচার করা চলে না।

"দ্বারকানাথ প্যারিসে খুব জাঁকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্ত্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারকনাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদেব একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হ'ল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায়কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন!"[৫২]

দ্বারকানাথ সম্পর্কে ম্যাক্স মুলারের অন্তরে যে-ধারণা চিরজাগ্রত ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে ১৮৮৩ সালে (২৭ সেপ্টেম্বর) রামমোহন রায়ের পঞ্চাশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ম্যাক্স ম্যুলারের ভাষণে। উক্ত ভাষণে মুল্যার বলেছিলেন: "Such was Rammohun Roy, to my mind a truly great man, a man who did a truly great work, and whose name, if it is right to prophesy, will be remembered for ever, with some of his fellow-labourers and followers, as one of the great benefactors of mankind." ঐ ভাষণেই দ্বারকানাথ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: "I knew him well while he was staying at Paris, and living there in good royal style. He was an enlightened, liberal-minded man, but a man of this world

rather than of the next."[৫৩]

১৮৪৬ সালের ১৮ মার্চ* দ্বারকানাথ প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে আসেন। ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য অটুট ছিল বলে ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন: "My uncle came here yesterday from Paris, in perfect health and so much so that he will be able to enjoy his English parties without the least fatigue, he almost never dines at home... ."[৫৪] দ্বারকানাথ বিলাতে যে অপরিমিত ব্যয় করে চলেছিলেন সেজন্য তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতা দেখা দিয়েছিল কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে ১৮৪৬**-এর ২২ মে তারিখে দ্বারকানাথ এক চিঠিতে পুত্র দেবেন্দ্র-নাথকে দূরবাসিনীর (দ্বারবাসিনী) জমিদারি দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করার জন্য লিখেছিলেন। ("... Also tell Deby Ray that if he could get a purchaser for Doorbassinee I shall have no objection to sell but not under 2,50,000 rupees—say two lakhs and fifty thousand rupees.")[৫৫] বিলাতে দ্বারকানাথের ব্যয়বাহুল্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃপালনির মন্তব্য উল্লেখনীয়— "Every mail from Calcutta brought parcels of Kashmir shawls, various kinds of *attar* (Indian perfume), *chutnies* and other culinary delicacies for gifts to ladies and for exotic entertainment."[৫৬] যা হোক, কিশোরীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন যে, "একটি নৈশ ভোজে যোগদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন একদিন বিকেলে দ্বারকানাথের কাছে এলেন।"[৫৭] এই সময়েই পার্লামেন্টে

---

* কৃষ্ণ কৃপালনি নির্দেশ করেছেন, ১৮ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে দ্বারকানাথ প্যারিস থেকে ফিরে আসেন, আর ব্লেয়ার ক্লিঙ বলেছেন, ৯ মার্চ ১৮৪৬ পর্যন্ত দ্বারকানাথ প্যারিসে ছিলেন।

** ব্লেয়ার ক্লিঙের গ্রন্থে (pp. 235-36 f.n. 27) উক্ত চিঠির সাল '১৮৪৫' বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা ভ্রান্তিবশতঃ বা মুদ্রণ প্রমাদ জনিত হয়ে থাকবে।

হিন্দুর সদস্য হওয়ার বিষয়ে দ্বারকানাথের সঙ্গে গ্লাডস্টোনের পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই কিশোরীচাঁদের গ্রন্থে ডাচেস অব ইনভার্নেসের গৃহে সান্ধ্যভোজের সময় দ্বারকানাথের অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।* কিশোরীচাঁদ লিখেছেন: "সে (জুন) মাসের ৩০ তারিখে ইনভার্নেস-এর ডাচেসের গৃহে একটি ডিনার পার্টিতে তিনি যান। ডিনার পার্টিতে সেই তাঁর শেষ অংশ গ্রহণ। ডিনারের সময় কম্পজ্বরের প্রবল আক্রমণ তাঁকে শয্যাশায়ী করে ফেলল।"[৫৮] সে-অসুস্থতা থেকে দ্বারকানাথ আর আরোগ্যলাভ করেন নি। অসুস্থ দ্বারকানাথকে ডাচেস অব ইনভার্নেস রোজ চিঠি লিখতেন এবং ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড প্রায় প্রতিদিন দেখতে আসতেন।[৫৯] কিন্তু উক্ত জ্বরের প্রকোপ থেকে দ্বারকানাথ আর মুক্তি পান নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: 'তাঁর শরীর ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল, তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে

* উল্লেখিত ঘটনাক্রম অনুসারে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক হলেও বলা কঠিন যে, গ্ল্যাডস্টোন ডাচেস অব ইনভার্নেস্ প্রদত্ত ডিনারের নিমন্ত্রণ করতেই দ্বারকানাথের নিকট এসেছিলেন কিনা। তবে, দ্বারকানাথের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তখন নানা ধরনের অনুমান-নির্ভর কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ-ভিক্টোরিয়া সম্পর্ক নিয়ে কিছু গল্প-কথার উল্লেখ (Kripalani: Dwarkanath Tagore, 1981, p 252 Note 15) যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রায় দ্বারকানাথ যে উদ্দেশ্যের (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইজারা লাভের) দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন বলে জানা যায় তা-ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া, বিলাতে দ্বারকানাথের চলাফেরা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতিও তাঁর স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে-কোন প্রকার মৃত্যুর সহায়ক হতে পারে বলে অনুমান করার মতোই ছিল। সন্দেহ নিরসনেই কিনা বলা কঠিন, তবে দ্বারকানাথের শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। [Mitra, K C: Memoir of Dwarkanath Tagore. 1870 p. 117 কিশোরীচাঁদ মিত্র: দ্বারকানাথ ঠাকুর

বলতেন "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হতে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান* হ'তে জুলাই মাসের ২৭ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন।'[৬০]
৫ আগস্ট ১৮৪৬, কেন্‌সাল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকানাথকে সমাহিত করা হয়েছিল। ভিক্‌টোরিয়া চারটি রাজকীয় শকট প্রেরণ করেছিলেন দ্বাবকানাথের শব বহন করার জন্য। কিশোরীচাঁদ উল্লেখ করেছেন, "তাঁর পুত্র এবং ভাগিনেয় ছাড়া শবযাত্রায় আর যাঁরা অংশ নিলেন তাঁরা হলেন: স্যর এডওয়ার্ড রিয়ান, মেজর হেণ্ডার্সন, জেনারেল ভেণ্টুরা, ডক্টব এইচ. এইচ. গুডিভ, ডক্টর র‍্যালে, মিস্টার উইলিঅম প্রিন্সেপ, মিস্টার আর রবার্টস, মিস্টার প্লাউডেন এবং মোহনলাল।"[৬১]
এ ছাড়া, দ্বারকানাথের অর্থানুকূল্যে ইংল্যাণ্ডে পাঠরত ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল বলে কিশোরীচাঁদ লিখেছেন।[৬১] শবাধারে ঢাকনির ওপর রূপার পাতে দ্বারকানাথের পরিচয় লেখা হয়েছিল: "বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, জমিদার"।[৬২]

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে বিলাতের পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। কিশোরীচাঁদ উল্লেখ করেছেন যে, 'মর্নিং হেরাল্ড' দ্বারকানাথকে প্রগতির অগ্রণী পথিক বলে বর্ণনা করেছিল এবং 'লণ্ডন টাইমস্' লিখেছিল: "বর্তমান যুগের মানুষের কাছে এই শ্রুতকীর্তি পুরুষ তাঁর অপরিমেয় মানবপ্রেমের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কোন জাতি-বৈষম্যের প্রশ্ন তাঁর দাক্ষিণ্য-প্রবৃত্তিকে কখনও খর্ব করে নি।"[৬৩] লক্ষণীয়, দ্বারকানাথের দাক্ষিণ্য প্রবৃত্তিই যেন সর্বত্র অনুভূত। কারণ, শুধু স্বদেশে নয়, বিলাতেও তাঁর কাছ

---

* Sussex জেলার Worthing-এর সমুদ্র উপকূলে ব্যক্তিগত চিকিৎসক মার্টিন সাহেবের পরামর্শে নিরাময় হওয়ার জন্য দ্বারকানাথ একমাস অতিবাহিত করেছিলেন।

থেকে ঋণ বা দান হিসেবে অর্থলাভের জন্য নিয়ত প্রার্থনা জানানো হতো।[৬৪] দ্বারকানাথের স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শুধু বিলাতেই নয়, স্বদেশেও তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায়* উত্থাপিত প্রস্তাব ও প্রদত্ত ভাষণসমূহে দ্বারকানাথের দাক্ষিণ্যের দৃষ্টান্তই বেশী উল্লিখিত হয়েছিল। (বেঙ্গল হরকরা, ৪ ডিসেম্বর ১৮৪৬)।[৬৫] কিন্তু দ্বারকানাথের বদান্যতায় মুগ্ধ তাঁর পরিচিত মহল স্মৃতিসভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে দ্বারকানাথের স্মৃতিরক্ষার কাজে শেষ পর্যন্ত কোন উৎসাহ দেখায় নি। কারণ দ্বারকানাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য গঠিত 'দ্বারকানাথ এণ্ডাউমেন্ট ট্রাস্ট' একটি অসফল দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। কৃষ্ণ কৃপালনির মতে— "The Dwarkanath Memorial was as still born as was the Rammohun Roy Memorial voted eleven years earlier."[৬৬]

রামমোহনের মতো বিলাতেই দ্বারকানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বটে, তবে দ্বারকানাথের বিলাত পরিক্রমা ব্যক্তিক বলয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, দু'বার বিলাত ভ্রমণ কালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ মেলামেশার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, কিন্তু সে-সময়ে স্বদেশের কোন সমস্যায় তিনি ভাবিত ছিলেন বলে জানা যায় না। প্রথমবার বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা এবং তার ফলশ্রুতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তা ভিন্ন দেশের শিল্প-কৃষির চরম দুরবস্থা, প্রশাসনিক নিপীড়নের দৃষ্টান্ত এবং আরও কত সমস্যায়ই না তাঁর স্বদেশ তখন জর্জরিত ছিল—এ সব বিষয়ে দ্বারকানাথের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় না। বরং উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইজারা লাভের বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যেই দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাতে গিয়েছিলেন। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ

---

* ১৮৪৬ সালের ২ ডিসেম্বর টাউন হলে উক্ত স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (কিশোরীচাঁদ মিত্র: দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্গানুবাদ,

বিষয়ে লিখেছেন যে—"It is believed that the important business which took the Prince to England was to try to negotiate with the British government for an izara (permanent lease) of the province of Bengal, Bihar and Orissa in supersession of the East India Company. He was well received by Queen Victoria. But this ambitious project of his came to nothing on account of his sudden death under somewhat mysterious circumstances."[৬৭] সুতরাং দ্বারকানাথের 'রহস্যাবৃত মৃত্যু' তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি কিনা তা অনুমানের বিষয়। তবে তাঁর বিলাত পরিক্রমা সাময়িক খ্যাতির হলেও তাঁর জীবনীশক্তির ক্ষয়কে যে ত্বরান্বিত করেছিল বাস্তব ঘটনাবলী থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। স্বদেশেও তিনি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন ছিলেন এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও আবহাওয়া তাঁর অনুকূল ছিল বলা যায় না। ইংরেজ সমাজ দ্বারকানাথকে সমাদর করেছিল তাদের স্বার্থে। আর কলকাতা-সমাজের সঙ্গে তিনি সংযোগ-বিয়োগের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন। এই সমাজের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার মত সাহস, অর্থবল ও প্রতিপত্তি তাঁর অবশ্যই ছিল। কিন্তু, সমাজে অগ্রচারীর ভূমিকা পালনে যে দায়িত্ববোধ ও জাতীয় কল্যাণচিন্তার অঙ্গীকার একান্ত বাঞ্ছনীয় তা দ্বারকানাথের প্রকৃতিতে ছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

সূত্রসূচি

১. কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর, (বঙ্গানুবাদ),

২. ঐ, পৃ ৮৮।

৩. Kripalani, K : Dwarkanath Tagore,

৪. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ৮৭।

৫. ঐ, পৃ ৮৭-৮৮।

৬. ঐ, পৃ ৮৯-৯০।

৭. Kling, Blair B. : Partner in Empire,

৮. Ibid, pp. 169-70.

৯. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১০০-১০২।

১০. ঐ, ১০২।

১১. Kripalani : op. cit., p. 167.

১২. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১১০।

১৩. Kripalani : op. cit., p. 156.

১৪. Ibid, p. 169.

১৫. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১২১।

১৬. Kripalani : op. cit., p. 171.

১৭. কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১১৪-১৫।

১৮. Kripalani : op. cit., p. 170-171.

১৯. Ibid, p. 173 ; কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১১৬-১৭।

২০. Kripalani : op. cit., p. 190.

২১. Ibid, p. 176 ; কিশোরীচাঁদ : ঐ, পৃ ১১৭-১৮।

২২. Kling : op. cit., p. 173.

২৩. Kripalani : op. cit., p. 174.

২৪. Kling : op. cit., p. 173.

২৫. Kripalani : op. cit., p. 121.

২৬. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,

২৭. ঐ, পৃ ৩১৮।